ঊনবিংশ শতাব্দীর পথিক

অরবিন্দ পোদ্দার

পরিবেশক
ইণ্ডিয়ানা লিমিটেড
২/১ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

প্রকাশক
গুরুপদ চক্রবর্তী
৭বি. বিডন রো
কলিকাতা-৬

প্রথম প্রকাশ
আষাঢ়, ১৩৬২
জুন, ১৯৫৫

অক্ষরশিল্প
বিশ্বরূপা

মুদ্রাকর
মণীন্দ্র কুমার চক্রবর্তী
৩৭, রিপন ষ্ট্রীট
কলিকাতা-১৬

তিন টাকা

আমার সুখদুঃখের সাক্ষী
শ্রীমান গুরুপদ চক্রবর্তী
স্নেহাস্পদেষু—

॥ সূচীপত্র ॥

কথারম্ভ

বাংলায় উনবিংশ শতাব্দী বাঙ্গালীর জাতীয় জীবন ও বিকাশধারার ইতিহাসে এক বিস্ময়কর ও চমকপ্রদ অধ্যায়। এখানে যুগপৎ ভাঙ্গা-গড়ার খেলা ; তাই, গোটা শতাব্দীই সৃষ্টির বেদনায় অস্থির।

ইংরেজ আগমনের ফলে বৈদেশিক ভাবধারার আঘাতে প্রাচীন জীবনাদর্শ, সামাজিক বিন্যাস, মূল্যবোধ, ধ্যান-ধারণা ইত্যাদি ভেঙ্গে পড়ছে ; জীবনের সমগ্র পরিসরে এক অভিনব সংঘাত। আর তারই অন্তর ভেদ করে নতুন জীবনাদর্শ, চিন্তা ও প্রত্যয়ের আবির্ভাব। প্রাচীনের যাওয়া এবং নতুনের আসার লগ্নটা স্বভাবতই অস্থির, বিশেষ কারণে তৎকালীন বাংলা একটু অস্বাভাবিক মাত্রায় অস্থির ; এবং সেজন্যই সেসময়কার ইতিহাসের আকর্ষণ দুর্বার। সেই অভিনব সমাজ-সংঘাত প্রত্যক্ষ জীবনের ক্ষেত্রে যেসব ব্যক্তিকে টেনে এনেছে, এবং যাঁরা এই সংঘাতের মর্মবাণী আত্মস্থ করে ইতিহাসের গোপন আকূতিকে বাস্তবে রূপায়িত করেছেন, তাঁরা বাঙ্গালীর ইতিহাসে অম্লান শ্রদ্ধায় প্রতিষ্ঠিত। তাঁদের বক্তৃতাদি এবং রচনা পাঠে আজও আমরা বিস্মিত হই, ভাবি, কী অসামান্য মনোবল, দুর্জয় সংকল্প ও সৃষ্টিশীল কর্মপ্রেরণার অধিকারীই না তাঁরা ছিলেন! আর কী বিচিত্র ভাবনা-কামনা আশা-উদ্দীপনায়ই না উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন!

কাল তাঁদের চিন্তা ও কর্মের মাধ্যমেই আপনাকে সৃষ্টি করেছে। সেজন্য, এক দিক থেকে তাঁদের জীবন-ইতিহাস উনবিংশ শতাব্দীর বাংলার সাংস্কৃতিক বিকাশধারারও ইতিহাস।

বর্তমান গ্রন্থে উনবিংশ শতাব্দীর চারজন অমর বাঙ্গালী পথিকের—

রামমোহন, বিদ্যাসাগর, কেশবচন্দ্র, বিবেকানন্দ—কর্ম, চিন্তা ও জীবনাদর্শকে অবলম্বন করে বাংলার জাতীয় বিকাশ ধারার ইতিহাস লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। ইংরেজ-অভিঘাতে কি নতুন আন্তর বেদনায় বাংলা ও বাঙ্গালী উদ্‌বুদ্ধ হয়েছিল, কোন্ কোন্ কর্মের মাধ্যমে ঐ প্রেরণা অভিব্যক্ত হয়েছে, কালপ্রবাহের সঙ্গে সঙ্গে আবার কোন্ নতুন প্রেরণায় সমাজ উদ্বেল হয়েছে, কোন্ পথেই বা সে নিজেকে সৃষ্টি করেছে, তারই ধারাবাহিক কাহিনী ও পরিণতি এই গ্রন্থে আলোচিত ও বিশ্লেষিত হয়েছে। বিশেষ বিশেষ কালে কি ভাবে বিশেষ বিশেষ সমস্যা ও সামাজিক দায়িত্ব দুয়ারে এসে হানা দিয়েছে, এবং তা সমাধানের জন্য সেকালের মানুষ কিভাবে সাড়া দিয়েছে, এ গ্রন্থ তারই ইতিহাস।

এই ইতিহাসের কিঞ্চিৎ পরিচয় পাওয়া যাবে লেখকের 'বঙ্কিমমানস' গ্রন্থে। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের মানসজীবন ও সাহিত্যকীর্তি ঐ গ্রন্থের মূল আলোচ্য বিষয় হওয়ায় বাংলার সাংস্কৃতিক প্রবাহকে সমগ্রভাবে তাতে স্থান দেওয়া সম্ভব হয়নি। অথবা, গোটা শতাব্দীর দর্পণও 'বঙ্কিমমানস' হতে পারেনি। সেখানে যা নেই বা আলোচনা করা সম্ভব হয়নি, তা রূপায়িত হয়েছে এ গ্রন্থে। এই হিসেবে গ্রন্থদ্বয় একে অন্যের পরিপূরক।

ভূমিকায় এ পর্যন্ত। বাকীটুকু বাঙ্গালী পথিকের জীবনালেখ্যে।

ভারতপথিক রামমোহন

॥ ১ ॥

আঠারশ' চোদ্দ সালের পর থেকে রাজা রামমোহন রায় যখন স্থায়ী-ভাবে কলকাতায় বসবাস সুরু করেন, ইংরেজের ভারত বিজয় তখন প্রায় সম্পূর্ণ। তখন পর্যন্তও ছিটমহলের ন্যায় ভারতের এ-প্রান্তে সে-প্রান্তে যেসব স্বাধীন রাজ্য ছিল, বিশেষতঃ উত্তর, উত্তর-পশ্চিম ভারতে যেসব দেশীয় নৃপতি আমীর-ওমরাহ্ সদম্ভে মাথা উঁচু ক'রে দাঁড়িয়েছিলেন, ইংরেজের সামরিক বল ও বুদ্ধি সেই সকল ছিটমহল গ্রাস ও নৃপতির দম্ভ চূর্ণকরণে ব্যাপৃত। আর যে সুবিস্তৃত অঞ্চল ইতিমধ্যেই ইংরেজকে ভবিষ্যৎ-প্রভু বলে' স্বীকার করে নিয়েছে, সেখানে চলেছে বিশাল সাম্রাজ্যস্থাপনের সুচতুর ব্যবস্থাপনা।

সন্দেহমাত্র নেই, ইংরেজ এ-দেশের বিধায়ক। কিন্তু, ইংরেজের বিধানের দাম অত্যন্ত বেশী। এই বিধান ভারতভূমিতে কায়েম হওয়ার পথে ভারতের শিল্পবাণিজ্য ইত্যাদি বিনাশ করেছে, এ-দেশের ধন-দৌলত-মণি-মাণিক্য ইত্যাদি লুণ্ঠিত হয়েছে, তাছাড়াও এ দেশবাসীকে নগদ অর্থমূল্য দিতে হয়েছে কোটি কোটি টাকা, প্রতি বছর, দীর্ঘকাল। এই অর্থ বিলেতে শিল্পবিপ্লবে ইন্ধন যুগিয়েছে। এই অর্থের পশ্চাতে যে অশ্রু লুক্কায়িত তার উল্লেখ বাহুল্য, নিষ্প্রোজন। বিভিন্ন শিল্পসম্ভার রপ্তানীকারক দেশ ভারত তখন আমদানীকারক দেশ; এখানকার শিল্প-বাণিজ্য অচির-ধ্বংসোন্মুখ। ভারতবাসীর নিত্যপ্রয়োজন মেটাতে ইংরেজ বৃটিশ পণ্য বিশেষতঃ ল্যাঙ্কাশায়ারের পণ্যসম্ভার আমদানী করেছে, কিন্তু দেশী শিল্পায়ণ নিষিদ্ধ।

অধিকৃত অঞ্চলে ইংরেজ দেশী প্রচলিত ভূমি-ব্যবস্থা ও ভূমি-সম্পর্ক পরিবর্তন করে দেশের অর্থনৈতিক কাঠামোতে বিপুল আলোড়ন এনেছে ; যদৃচ্ছা তালুক বিলি ও জমিদার সৃষ্টি, পাঁচসালা-একসালা ও পরিশেষে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মাধ্যমে ইংরেজ ভারতে এই প্রথম ভূমিতে স্বত্বস্বামিত্বের চেতনা আনয়ন করেছে—জমি কেনাবেচার পণ্যে পরিণত হয়েছে। বিধ্বস্ত দেশী শিল্পের কর্মবিচ্যুত কর্মী ও মহাজন উপায়ান্তরহীন হয়ে জমির উপর নির্ভরশীল হ'তে আরম্ভ করেছে।

এই গেলো ক্ষতির দিক। লাভের দিক হ'লো, ইংরেজ-বিজয় ভারতকে মধ্যযুগীয় জীবনযাত্রার তামস থেকে বাহিরবিশ্বের সূর্যালোকে টেনে এনেছে ; গ্রামীণ সংস্কৃতির ও অর্থনৈতিক সংগঠনের স্ব-নির্ভর কাঠামো, পরস্পর ছাড়াছাড়া বিচ্ছিন্ন মনোভাব, এবং ঐ সংগঠন-আশ্রয়ী অযৌক্তিক ক্রিয়াকলাপ, ব্যভিচারদুষ্ট ভাবধারা ইত্যাদি চূর্ণবিচূর্ণ ক'রে দিয়েছে। পূর্বের ন্যায় জীবন আর নিথর, নিশ্চল নিঃস্পন্দ দাঁড়িয়ে থাকবে না, বৃটিশ পণ্যের জাহাজে আরোহণ করে এবং সম্ভবত আরও পরে রেলওয়ে ট্রেণ ও টেলিগ্রাফের তার ধরে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডময় বিস্তৃতি লাভ করবে।

ভারতের সমাজজীবনের গতির পালে হাওয়া লেগেছে। হাওয়া এনেছে ইংরেজ। এই কর্মের পশ্চাতে, অগোচরে ভারতবর্ষে জাতি গঠনের কাজ সম্পন্ন হয়ে চলেছে।

বলা বাহুল্য, এইমাত্র উপরে যে ধ্বংসের কথা বলা হ'লো, সেই ধ্বংসই ইংরেজের সংগঠন। কারণ, ভূমির সহিত সম্পূর্ণ সম্পর্কহীন একদল লোককে ভূমির মালিক বানিয়ে ইংরেজ তার রাজ্য শাসনের ইমারত গড়ে তুলছিল,—যাদের স্কন্ধে নির্ভর করে তার ভারতশাসন হ'বে নিরাপদ, নির্ভয় ও অত্যাচারে নির্বিবাদ। শাসিত আর শাসকের মধ্যে

যারা সেতুবন্ধের মত বিরাজ করবে শুধু।

ঐসব নব ভূম্যধিকারীর দল ছাড়া বৈষয়িক গরজের তাগিদে আরও একদল লোক ইংরেজ বণিকের এজেন্ট বা মুৎসুদ্দি বা দেওয়ান রূপে কাজ করে' করে' সম্ভবত আপনাদের অজ্ঞাতসারেই ইংরেজ রাজ-শক্তির একান্ত বংশবদ সার্থক ভৃত্যে পরিণত হ'য়ে গিয়েছিল। এদের জীবিকা তথা বৈষয়িক জীবন ছিল সর্বতোভাবে বৃটিশ বণিকের করুণা-নির্ভর। সম্ভবত এই চেতনা বা স্বার্থবোধই তাদের নিঃসংশয়ে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছে দিয়ে থাকবে যে, ইংরেজরা এদেশের ভবিষ্যৎ, এই ভবিষ্যতকে আশ্রয় করে তারা জীবনকে রূপায়িত করছেন। দৃষ্টি তাদের নির্ভুল। এই বৈষয়িক চেতনার সঙ্গে কালক্রমে অন্যান্য উপকরণ এসে মিশ্রিত হ'য়েছে,—ইংরেজের সঙ্গে মেলামেশা, শিক্ষাদীক্ষা পুঁথিপত্র ইত্যাদি থেকে প্রাপ্ত ভাবরাশি ও তার প্রতি শ্রদ্ধা ইত্যাদি। শ্রদ্ধা বিরোধ জাগায়নি, আকর্ষণ বৃদ্ধি করেছে। সম্পূর্ণ অভিনব অর্থনৈতিক সম্পর্ক থেকে উদ্ভূত বলে দেশীয় জনসাধারণ ও সমাজ-জীবনের সঙ্গে তারা আত্মিক মিল অনুভব করেনি—দেশের হয়েও যেন দেশজ নয়, কৃষ্ণ হয়েও যেন শ্বেতগন্ধী।

কিন্তু, ভারতের ইতিহাসের অনস্বীকার্য কৌতুক এই যে, বৃটিশ অর্থ-নৈতিক ব্যবস্থা থেকে উদ্ভূত এই নতুন ভূম্যধিকারী শ্রেণী এবং ইংরেজ বণিকের দক্ষিণহস্ত ভাগ্যান্বেষী মধ্যবিত্তের দলই ভারতের নতুন জীবন ও সংস্কৃতির অগ্রদূত ও নির্মাতা। সুতরাং, এক দিক থেকে, এদের জীবন-ইতিহাস বৃটিশ-ভারতের জীবন ও সংস্কৃতিরও ইতিহাস। (১)

(১) এ সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনার জন্য লেখকের 'বঙ্কিম-মানস' দ্রষ্টব্য।

এরা ছিল ইংরেজের নিকট ভারতের গণ ও সমাজজীবনের ভূমিকা-স্বরূপ। ভারতের সমাজ, সমাজজীবন, রীতিনীতি, বিধিবিধান ইত্যাদি সম্পর্কে প্রাথমিক জ্ঞানের পাঠ এরাই ইংরেজকে সরবরাহ করত ; আর বৈষয়িক এবং শাসনকার্যাদির ব্যাপারে ইংরেজকে এদের উপরই নির্ভর করতে হ'তো। ইংরেজশাসন ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থাদির সুফল অথবা কুফল, তার সামাজিক প্রতিক্রিয়া ও পরিণতি ইত্যাদি সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক সমস্যা সম্পর্কে উনবিংশ শতকের গোড়ার দিকের ভারতীয়রা গভীরভাবে চিন্তা করার অবসর পায়নি ; ইংরেজ প্রভু, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ শাসক, তার কর্মে নবীন গতি, কণ্ঠে অশ্রুতপূর্ব বাণী, সে বুদ্ধিতে অপরাজেয়, আদর্শে অভিনব, আর ইংরেজের সঙ্গে বাণিজ্য সমষ্টিগত ভাবে না হোক ব্যক্তিগত ও পরিবারগতভাবে অসামান্য সমৃদ্ধির দ্যোতক ; সুতরাং এইসব ব্যবহারিক সুফল থেকে যদি বঞ্চিত হ'তে না হয়, তাহ'লে ইংরেজকে সমর্থন কর, তার রাজ্য প্রতিষ্ঠায় সহায়ক হও—ইহাই কালের নীরব নির্দেশ।

ঐ আমলের বাঙ্গালী চিন্তানায়কবৃন্দ কালের নির্দেশ পালন করেছেন, অন্যথা করেননি।

॥ ২ ॥

কলকাতায় স্থায়ী বসবাস আরম্ভ করার বহু পূর্ব থেকেই রাজা রামমোহন ইংরেজ-সংস্পর্শে এসেছিলেন।

তিনি কোম্পানীর কাগজ কিনতেন এবং তার ব্যবসা করতেন ; ইংরেজ সিভিলিয়ানদের টাকা ধার দিতেন, তাঁদের কয়েকজনের আনুকূল্যে তিনি কয়েক মাস ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর চাকুরি এবং কিছু-কাল টমাস উডফোর্ডের ও সুদীর্ঘ ক'বৎসর জন ডিগবীর ব্যক্তিগত দেওয়ান রূপে কাজ করেন, এবং তাঁদের সঙ্গে দেশদেশান্তর ভ্রমণ

করেন। এইসব বৈষয়িক কর্ম, ব্যবসা এবং ইংরেজ রাজপুরুষদের ঘনিষ্ঠ সংযোগ-সাহচর্য থেকে রাজার প্রভূত অর্থসমাগম হয়েছিল, তিনি বিভিন্ন স্থানে তালুক এবং কলকাতায় একাধিক বাড়ী ক্রয় করেছিলেন। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিল, এবং ঐ কলেজের মাধ্যমে প্রায় সমস্ত ইংরেজ সিভিলিয়ানের সঙ্গে মেলামেশা করবার অবাধ সুযোগ হয়েছিল তাঁর। এই মেলামেশা, ব্যবহারিক জীবনাচরণ, এবং বৈষয়িক সমৃদ্ধির আত্যন্তিক চেতনা গোপনে তাঁর চিরাচরিত ধ্যান-ধারণা রুচি অভ্যাস ইত্যাদির মূলে নিশ্চিত কুঠারাঘাত করে থাকবে; তাঁদের মুখে প্রতিনিয়ত প্রচলিত হিন্দু সামাজিক আচার-আচরণ, নিষ্ঠার বিধান, কুসংস্কারাচ্ছন্ন মনোবৃত্তির সমালোচনা ও বিদ্রূপ রামমোহনের মনে নিজেদের পঙ্কিল সমাজজীবন সম্পর্কে ধিক্কার এনে দিয়ে থাকাও স্বাভাবিক; বিষয়কর্মের আকর্ষণে তিনি যে তাঁর পিতামাতা স্ত্রীপুত্র ও অন্যান্য পরিবারবর্গের স্নেহ-স্পর্শ থেকে দূরে সরে যাচ্ছিলেন তা নয়, মন ও মানস-জীবনের দিক থেকে তিনি প্রবেশ করছিলেন নতুন এক পৃথিবীতে, সেখানে তাঁর পিতৃপুরুষের ভাবরাশির কোন স্থান ছিল না।

বিষয়কর্মের প্রলোভন ইংরেজের প্রতি যে ভালবাসা, হয়তবা খানিকটা শ্রদ্ধাও, এনে দিয়েছিল তা উত্তরোত্তর দৃঢ় ও ঐকান্তিক হ'তে থাকে, যখন জন ডিগবীর সহায়তায় তিনি ইংরেজী সাহিত্য-দর্শন-রাজনীতি-রাষ্ট্রনীতির সুগভীর জ্ঞানসমুদ্রে প্রবেশ করেন। ইংরেজের সরস সাহিত্য, সামাজিক ন্যায়বিচার, যুক্তিধর্মী মন ও মনন, বৈজ্ঞানিক নিষ্ঠা, শিক্ষার ও আইনের সার্বভৌম আদর্শ তাঁকে অজানা পৃথিবীর সন্ধান দিলো। যা কিছু জানা সম্ভব তিনি জানলেন, যা কিছু অধ্যয়ন সম্ভব তিনি অধ্যয়ন করলেন, এবং এই অধ্যয়ন-উপার্জিত সম্পদ তিনি ব্যক্তিগত ও সমাজ জীবনে প্রয়োগ করতে শিখলেন। বৈষয়িক বন্ধুতা

ধীরে ধীরে আদর্শগত আনুগত্যে রূপান্তরিত 'হলো ; ইংরেজ এখন আর শুধুমাত্র বৈষয়িক কর্মাদির সহায়ক ও মিত্র নয়, ভাবজীবন তথা মনোজীবনের নেতা, একচ্ছত্র অধিপতি। পরবর্তীকালে যখন রামমোহন এদেশের সমৃদ্ধিশালী নাগরিকরূপে কলকাতায় বসবাস সুরু করলেন, তখন এই বন্ধন আরও বেশী শক্তিশালী হয়। শুধু রাজকর্মচারী নয়, খৃষ্টান জগতের নেতৃস্থানীয় সমস্ত ব্যক্তির সহিত তাঁর সংযোগ ও মিত্রতা স্থাপিত হয়. সামাজিকতা পানভোজনাদি প্রচলিত হয়, ইউরোপীয় পর্যটক ও অতিথিবৃন্দ রাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে যান, চিন্তা মনন বুদ্ধি ও আদর্শের মানদণ্ডে পরস্পর পরস্পরকে সমগোত্রীয় বলে গ্রহণ করেন।

রামমোহনের মানস-জীবনের বিবর্তনে কলকাতার সদর দেওয়ানী আদালতের কাজী, ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের ফার্সী মুন্সী ও কলকাতায় অবস্থিত অন্যান্য মৌলবীদের প্রভাবও উপেক্ষনীয় নয়। সে-কালের রীতি অনুযায়ী রামমোহন মুসলমান মৌলবীদের নিকট আরবী-ফার্সী এবং মুসলিম আইন শিক্ষা করেন। তাঁদের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ মেলামেশা ইত্যাদিও ঘনিষ্ঠ ছিল, একত্র পানভোজনাদিতে তিনি কুণ্ঠিত ছিলেন না, এবং কুসংস্কার ও গোঁড়ামি থেকে মুক্তির নিদর্শনস্বরূপ মুসলমান বাবুর্চিও নিয়োগ করেছিলেন। মুসলমানী চোগাচাপকান, জোব্বা পরিধান করতে তিনি ভালবাসতেন। ফার্সী সাহিত্যে তাঁর অধিকার ও অনুরাগ সামান্য ছিল না। এই মুসলমান পণ্ডিতদের মুখেও হিন্দু আদর্শের বিরূপ সমালোচনা, কোরাণের বাণী 'সমগ্র মানুষ এক জাতি', এবং একেশ্বরবাদের আদর্শ রামমোহন শুনে থাকবেন। তাঁরাও তাঁর আদর্শান্তর গ্রহণে সহায়তা ও চিন্তাকে স্থায়ীভাবে প্রভাবিত করে থাকবেন।

রামমোহন অবশ্য সংস্কৃত শাস্ত্রাদিতে সুপণ্ডিত ছিলেন। তথাপি

তাঁর মানস-জীবনের উপর কোন্ কোন্ প্রত্যক্ষ প্রভাব ক্রিয়াশীল ছিল, এবং কোন্ প্রভাব তাকে নির্দিষ্ট গতিপথে নিয়ন্ত্রিত করেছে, সংক্ষেপে তার আলোচনা করলাম এই জন্যে যে, মানুষের মন ও মানস-জীবন স্বয়ং-সম্পূর্ণ অথবা স্বয়ম্ভূ নয়। ইতিহাস, ব্যবহারিক জীবনের ক্ষেত্র, পরিবেশের প্রবাহিত জীবনধারা ও ঘটনাপুঞ্জ মনের উপকরণ যোগায়, এবং অধ্যয়ন-মনন-অনুশীলনের সাহায্যে মন তা অবলম্বন করে জীবনাদর্শ রচনা করে। এই জীবনাদর্শ বাইরের জীবনধারার সঙ্গে অচ্ছেদ্য বন্ধনে সম্পৃক্ত, বহু ক্ষেত্রেই তা এক। তাই দেখা যায়, যাঁরা ইতিহাস-স্রষ্টা, যুগধর্ম-নিয়ামক, তাঁদের অন্তর-প্রেরণার সঙ্গে কালের অন্তর-প্রেরণার কোন বিরোধ তো নেই-ই, বরং সর্বত্রই ঐক্যবন্ধনে বাঁধা। এই অর্থে, মনের ক্রিয়া বাস্তব জীবনের উপর নির্ভরশীল, মন কালের নিয়ন্ত্রণাধীন। নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক কাল মানুষের সম্মুখে যে বিশেষ সমস্যা, প্রশ্ন, দায় ও দায়িত্ব এনে দেয়, যে ভাবনা-চিন্তা-কামনায় ভাবায় ও উদ্বুদ্ধ করে, সে-কালের মানুষ তাতেই সাড়া দেয়; জ্ঞাতসারে হোক অথবা অজ্ঞাতসারেই হোক, কালের অন্তর-প্রেরণাকে তার নির্দিষ্ট পরিণতিতে পৌঁছে দেবার কর্মে আত্মনিয়োগ করে। সেই জন্যই ভিন্ন ভিন্ন কালের মানুষের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন ধ্যানধারণা ও কর্মের সাক্ষাৎ পাই আমরা। এখানে পার্থক্যটা শুধু ব্যক্তিগত বা প্রতিভাগত নয়, কালগত, কালের প্রয়োজনগত। মনের সঙ্গে বাহির-পৃথিবীর অথবা আবেষ্টনীর এই মিলনের মধ্য দিয়ে যে তরঙ্গ সৃষ্টি হয়, তাকেই আমরা অখণ্ড জীবনপ্রবাহ অথবা কর্মপ্রবাহ বলে জানি। জীবনের তথা কালের এই সামগ্রিক রূপটিই ব্যক্তি বিশেষের জীবনধারা এবং মানস-জীবনকে মোটামুটিভাবে নিয়ন্ত্রিত করে, নির্দিষ্ট পথে পরিচালিত করে।

রাজা রামমোহন সামাজিক কর্মজীবনে অবতীর্ণ হওয়ার বহু র্বপূ

থেকেই খৃষ্টান মিশনারী পাদ্রীরা হিন্দু পৌত্তলিকতা ও আচারধর্মের বিরুদ্ধে অভিযান সুরু করেছিলেন। খৃষ্টধর্ম প্রচারের কর্মে তাঁরা দু'চারজন হিন্দুর ব্যবহারিক সহায়তাও লাভ করেছিলেন। হিন্দুর পৌত্তলিকতা বিনষ্ট অথবা খৃষ্টধর্ম প্রতিষ্ঠিত হোক বা না হোক, ইংরেজ তখন সুপ্রতিষ্ঠিত। ইংরেজ ভবিষ্যতে অথবা চিরকাল এদেশে থাকবে না, এ চিন্তা সে-কালে কোন ভারতীয়ের মনে সম্ভবত দেখা দেয়নি ; এমন কি যাঁরা ইংরেজী শিক্ষার এবং 'কলোনাইজেশনের' বিরোধিতা করেছিলেন, তাঁদের মনেও না। ইংরেজ এসেছে, ইংরেজ থাকবে, ইংরেজের যাওয়াটা নানা দিক থেকেই অবাঞ্ছনীয় ; এ পরি-

তে একমাত্র কর্তব্য ইংরেজ আগমনে যে রূপান্তর ও সুফলের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে, তাকে চিরস্থায়ী করা। তার জন্য ব্যবহারিক আচার-আচরণ সামাজিক বিধিবিধান, আচরিত ধর্মকর্মে যদি রদবদল করতে হয়, তা এ কান্তই বাঞ্ছনীয়। যুগ-মনোভাব অনেকটা এই আকৃতির ; সুতরাং, রামমোহন যখন পরবর্তীকালে ঘোষণা করেন, 'It is, I think, necessary that scme changes should take place in their religion at least for the sake of their political advantage and social comfort', তখন যুগের অন্তর-প্রেরণাই তাঁর মাধ্যমে অভিব্যক্ত হ'য়েছে বলে মনে করি।

॥ ৩ ॥

'রাজনৈতিক সুবিধা ও সামাজিক সুখশান্তি' লাভের আকাঙ্ক্ষা রাজা রামমোহনের কর্ম, চিন্তা ও মানস-জীবনকে বহুলাংশে প্রভাবিত করেছে। ইংরেজের আশ্রয়ে ও সাহচর্যে লাভবান অনেকের মত তিনিও ভারতে ইংরেজ-বিজয়কে ঈশ্বরের আশীর্বাদস্বরূপ জ্ঞান করতেন। 'খৃষ্টান

জনসাধারণের নিকটসর্বশেষ আবেদন-এ তিনি ইংরেজের মাধ্যমে এই হতভাগ্য দেশকে তার পূর্বতন শাসনকর্তাদের স্বৈরাচারী অত্যাচার থেকে অপ্রত্যাশিতভাবে উদ্ধার করার জন্য ঈশ্বরকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। ইংরেজের সাহিত্য-দর্শন ও ব্যবহারিক শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করে ইংরেজ জাত সম্পর্কে তাঁর মনে যে উচ্চাশা ও শ্রদ্ধা উদ্রিক্ত হয়, ঐ আবেদনে তিনি তাও ব্যক্ত করেন ; ইংরেজ এমন জাত যারা শুধুমাত্র নিজেরা নাগরিক ও রাজনৈতিক স্বাধীনতা ইত্যাদি উপভোগ করে না, যেদেশে তাদের প্রভাব বিস্তৃত হয় সেখানেও স্বাধীনতা, সামাজিক সুখ-শান্তি, সাহিত্য ও ধর্মবিষয়ে নিরপেক্ষ চর্চা ও অনুশীলন ইত্যাদির ব্যবস্থাদি করে ('a nation who not only are blessed with the enjoyment of civil and political liberty, but also interest themselves in promoting liberty and social happiness, as well as free inquiry into literary and religious subjects, among those nations to which that influence extends')। এই ইংরেজ শাসনকে তিনি সর্বান্তঃকরণে গ্রহণ করেছেন ; আর শুধু তিনিই বা কেন, পূর্বে যে নতুন ভূম্যধিকারীর কথা বলা হ'য়েছে তারা, ব্যবসাবাণিজ্যের দৌলতে সম্পদ আহরণ করেছে যারা এবং ইংরেজের শাস্ত্রাদির আস্বাদন লাভ করেছে যারা, তারা সকলেই একে গ্রহণ করেছে, এবং এর বিস্তৃতি ও নিঝঞ্ঝাট বিকাশধারায় সহায়তা করতেও প্রস্তুত। কায়মনোবাক্যে ইংরেজের মঙ্গলকামনাও তারা করেছে। (২)

সুতরাং কিভাবে এই শাসনব্যবস্থা স্থায়ী হয়, কোন্ পথে প্রাগ্রসর

(২) তৃতীয় মারাঠা যুদ্ধ ও নেপাল অভিযানের সময় কলকাতার নাগরিকগণ ইংরেজের বিজয় কামনা ক'রে প্রার্থনা করেছিল।

ভারতীয়দের সহিত এই শাসনব্যবস্থার যোগসূত্র ঘনিষ্ঠ হয়, কিভাবে এ-দেশবাসীরা ইংরেজের শাস্ত্রসম্মত নাগরিক ও সামাজিক অধিকারাদি ভোগ করতে পারে, কিভাবে ভারতবর্ষ শিক্ষাদীক্ষা-জ্ঞানবিজ্ঞান ও সভ্যতায় ইংল্যাণ্ডের মত সুউন্নত ও সুগর্বিত হতে পারে, তাই ছিল রামমোহনের আত্যন্তিক চিন্তা ও কর্মপ্রেরণা।

অর্থাৎ ইংরেজ-বিজয়ে ভারতে ধনতান্ত্রিক বিকাশের যে সম্ভাবনা-পথ উন্মুক্ত হয়েছে, ভারতবর্ষ তার পরিপূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করুক অথবা তাকে সে সুযোগ দেওয়া হোক, এই ছিল তাঁর ধ্যান। সে আশায়ই তিনি ভারতে ইংরেজের 'কলোনাইজেশন' সমর্থন করেছিলেন। তাঁর আন্তরিক বিশ্বাস ছিল, যদি ইংরেজরা অত্যধিক সংখ্যায় এ-দেশে বসবাস আরম্ভ করে, তাহলে প্রতি বৎসর যে কোটি কোটি টাকা ইংল্যাণ্ডে চালান দেওয়া হচ্ছে তা বন্ধ হবে; এ-দেশবাসী ইংরেজের সুখসুবিধা স্বাচ্ছন্দ্য ও অন্যবিধ উন্নতির জন্য এ-দেশেই ইংরেজরা সে অর্থ ব্যয় করবে, ভারত শিল্পসমৃদ্ধ হবে, বৈষয়িক সমৃদ্ধিতে ভারতও একদিন ইংল্যাণ্ডের সমপর্যায়-ভুক্ত হ'বে। তাঁর মানস-চক্ষে ভারতের সেই গৌরবোজ্জ্বল চিত্রই উদ্‌ভাসিত হ'তো। ১৮২৯ সালে কলকাতার টাউন হলে 'কলোনাই-জেশন' প্রস্তাব সম্পর্কে যে সভা হয়, তাতে তিনি ঘোষণা করেন, 'আমার নিশ্চিত বিশ্বাস যে, ইউরোপীয় ভদ্রমহোদয়দের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ যতো বেশী হবে, সাহিত্য, সমাজ ও রাজনৈতিক ব্যাপারে আমাদের ততো বেশী উন্নতি হবে।' তাঁর বিশ্বাস ছিল, কলোনাই-জেশনের ফলে ক্রমে ক্রমে যে ভারতের আবির্ভাব হ'বে, সেই ভারত কখনও ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে যোগাযোগ ছিন্ন করতে চাইবে না, বরং পারস্পরিক স্বার্থবোধ সে সম্পর্ককে চিরকাল অটুট রাখবে।

ইংরেজ দার্শনিক ও রাষ্ট্রনীতিবিদ পণ্ডিতদের রচনাপাঠে ইংরেজের

নাগরিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকারবোধের প্রতি, তাঁদের বুদ্ধি-বাদ ও যুক্তিবাদী নিষ্ঠার প্রতি রাজার অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ও অনুরাগ জন্মেছিল। তাঁর বিশ্বাস ছিল, ইংলণ্ডেশ্বরের দৃষ্টিতে অথবা বৃটিশ আইনের চোখে শ্বেতকায় প্রজা ও কৃষ্ণকায় প্রজার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। শ্বেতকায় প্রজা যেসব অধিকারাদি ভোগে অধিকারী, কৃষ্ণকায় প্রজাও সেইসব অধিকার থেকে বঞ্চিত হবে না। ইংরেজের প্রতি তাঁর বিশ্বাস ও শ্রদ্ধার অন্যতম কারণ তো এই যে, সে তার পদানত দেশের স্বাধীনতা ও সামাজিক ন্যায়বিচারের প্রতি যত্নবান হয়! তাই বৃটিশ আইন, নাগরিক অধিকার, সামাজিক বিধান ইত্যাদি যাতে সত্বর ভারত-বর্ষেও প্রযোজ্য হয়, এ-দেশবাসীরা সে সুবিধান অনুযায়ী সুখশান্তিপূর্ণ জীবনযাপন করতে সমর্থ হয়, রামমোহন সেজন্য যত্নবান হন। 'ইংলণ্ডেশ্বরের নিকট আবেদন'-এ তিনি বলেন, মুসলমান রাজাদের আমলে ভারতের হিন্দুরা মুসলমানদের সমান রাজনৈতিক অধিকার ভোগ করত ; রাষ্ট্রশাসন কাঠামোর দায়িত্বশীল পদে তারা অধিষ্ঠিত হ'তো এবং অনেকে নবাবের পরামর্শদাতারূপেও নিযুক্ত হ'তো। কিন্তু, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলে ভারতীয়দের রাজনৈতিক অধিকারাদি বিলুপ্ত হ'য়েছে ; অবশ্য তথাপি তারা নাগরিক ও ধর্মীয় অধিকারাদি লাভেই সন্তুষ্ট। কিন্তু, বৃটিশ-সরকার যদি ভারতীয়দের ঐসব অধিকার মঞ্জুর ও সংরক্ষণ না করেন, তা'হলে সুখশান্তির যে আশায় ভারতীয়রা বৃটিশ-সরকারের উপর নির্ভর করছে, তার ভিত্তি নষ্ট হ'য়ে যাবে। তিনি বিভিন্ন সময়ে বারবার ঘোষণা করেছেন যে, যোগ্যতা ও দক্ষতা অনুযায়ী ভারতীয়দের দায়িত্বশীল সরকারী পদে নিয়োগ করেই বৃটিশ-সরকার রাষ্ট্রব্যবস্থায় ভারতীয়দের সমর্থন অর্জন করতে পারেন।

রাজার এই চিন্তা ও দাবীর মধ্যে ভারতবর্ষ এবং বৃটিশশাসন উভয়ের

কল্যাণচিন্তাই বর্তমান ছিল। রাজ্যশাসনের ব্যাপারে ভারতীয়রা ইংরেজের অংশীদাররূপে যদি স্বীকৃতিলাভ করে তা'হলে শিক্ষাদীক্ষা বুদ্ধিতে যেমন তারা (এবং তাদের মারফৎ ভারতবর্ষ) উন্নতিলাভ করবে তেমনি বৃটিশ কর্তৃপক্ষেরও সুবিধা। কারণ, এ-দেশীয় জনসাধারণের মধ্যে বুদ্ধিমত্তা ও কর্মনিপুণতায় যাঁরা অগ্রণী, তাঁরা যদি রাজশক্তির সহায়ক হন তবেই রাজশক্তি নিরাপদ। দাতা ও গ্রহীতা উভয়েরই এপথে সমৃদ্ধি। ১৮২৩ সালের প্রেস আইনের প্রতিবাদে রামমোহন যখন নিতান্ত অনিচ্ছা ও দুঃখের সঙ্গে তাঁর ফার্সী পত্রিকা 'মীরাৎ-উল-আখ্‌বার' বন্ধ করে দেন, তখন তাঁর মনে এই দুঃখও থাকা খুবই স্বাভাবিক যে, ইংরেজরাজের শ্বেতকায় প্রজা যে অধিকার ভোগ করে, তিনি তাঁর কৃষ্ণকায় প্রজাকে সেই অধিকার থেকে বঞ্চিত করছেন। বৃটিশ আইন ও নীতিশাস্ত্রাদিতে যে সত্য স্বীকৃত, মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা অস্বীকার ক'রে ইংরেজ সেই সত্যকে অস্বীকার ক'রতে চলেছে। যে-জাত বেন্থামের জন্য গর্বিত, তারা এরূপ নির্বুদ্ধিতার পরিচয় দেবে, রামমোহনের নিকট তা কল্পনাতীত। ইংরেজ-দত্ত যুক্তিবাদকে আশ্রয় ক'রে অত্যন্ত তেজোদৃপ্ত ভাষায় তিনি ঘোষণা করলেন, এঅন্যায়, ন্যায়বিচারবিরোধী। সেই একই যুক্তি ও বুদ্ধিবাদের উপর নির্ভর করে তিনি বিশ্লেষণ করলেন, স্বাধীন সংবাদপত্র কিভাবে বৃটিশ শাসনব্যবস্থার সহায়ক হ'তে পারে। তিনি বলেন, স্বাধীন সংবাদপত্র পৃথিবীর কোন দেশে কখনও বিপ্লব ঘটায়নি। কারণ, স্থানীয় শাসনকর্তা ও রাজ-কর্মচারীদের আচরণ থেকে যে অসন্তোষ দেখা দেয়, তার বিরুদ্ধে জনসাধারণ যদি সর্বোচ্চ শাসনকর্তার নিকট নালিশ করতে এবং প্রতিকার আদায় করতে পারে, তাহ'লে বিপ্লবের বীজ বিনষ্ট হয়ে যায়।

পক্ষান্তরে, যেখানে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা নেই এবং ফলে জনসাধারণের দাবীদাওয়া, অভিযোগ অভিব্যক্ত ও মেটানো হয়নি এবং হয়না, সেখানেই বিপ্লবের বন্যা আসে। সুতরাং সংবাদপত্রের স্বাধীনতা প্রার্থনায় ন্যায়বিচার ও সত্য প্রতিষ্ঠার দাবী যেমন আছে, তেমনি বৃটিশরাজের সুশাসন সংরক্ষণের সম্ভাবনাও তাতে বর্তমান।

তিনি আরও বলেন, মানুষ যখন তাদের শাসনকর্তার নিকট থেকে ন্যায়বিচার, সুশাসন এবং অসন্তোষের আশু নিবৃত্তিলাভ করে তখন সেই শাসক ও শাসনব্যবস্থার প্রতি আনুগত্যজ্ঞাপনে তারা বিন্দুমাত্রও কুণ্ঠিত হয় না। বিদ্রোহ করে তখন, যখন লাঞ্ছিত হয়। বৃটিশ শাসনব্যবস্থার সংস্কারের জন্য রামমোহন যে পরামর্শ দেন, এদেশবাসী ইংরেজ রাজ-কর্মচারীকে আইন-প্রণয়নের ক্ষমতা না দেওয়ার জন্য রাজা যে দাবী জানান, এবং বৃটিশ আইনের ব্যবহারিক প্রয়োগ-পদ্ধতি সম্পর্কে তিনি যেসব সুপারিশ করেন, তার মূল এবং একমাত্র লক্ষ্য ছিল, ভারতবর্ষ যেন উদ্ধত রাজকর্মচারীর দুর্ব্যবহারে লাঞ্ছিত না হয়, যেন বৃটিশ সামাজিক আইনের সার্বভৌমত্ব ও কল্যাণ থেকে ভারতবর্ষের কৃষ্ণকায় প্রজা বঞ্চিত না হয়। রাজার সমস্ত সিদ্ধান্তই যুক্তিবাদী মনন ও আদর্শসম্মত।

অর্থাৎ, তার সববিধ কর্ম, চিন্তা, মনন ও আচরণের মূলে আছে সেই রাজনৈতিক সুবিধা ও সামাজিক সুখশান্তি লাভের আকাঙ্ক্ষা,—বৃটিশ আইন ও সামাজিক বিধিবিধানে যা সর্বথা স্বীকৃত। এই আকাঙ্ক্ষাই তাঁর সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক আচরণকে স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল করেছে। ভারতের সামাজিক জীবনে ও ভারতীয়দের ধর্মমতে সংস্কার-সাধনের চেষ্টা করে তিনি ভারতবর্ষকে ঐ সুবিধালাভের উপযোগী করায় সচেষ্ট হয়েছিলেন। তাঁর আচরণ একদিকে ভারতের এবং ভারতীয়

জনসাধারণের বৈষয়িক ও আধ্যাত্মিক কল্যাণকামী; অপরপক্ষে, তা কল্যাণদাতা ও ভারতের ভাগ্যবিধাতা ইংরেজ রাজশক্তির সহায়ক, এবং ভারতে বৃটিশ-শাসন প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী।

॥ ৪ ॥

ইতিহাসের অন্তর-প্রেরণা, তাই আশ্চর্যভাবে রামমোহনের মনন ও কর্মের ভিতর দিয়ে অভিব্যক্তি লাভ করেছে।

সেই অন্তর-প্রেরণাই রামমোহন ও সেকালের অন্যান্য প্রাগ্রসর ভারতীয়কে ভারতে বৃটিশ শাসন ও সাম্রাজ্যবাদ প্রতিষ্ঠার সহায়করূপে ব্যবহার করেছে। ইংরেজ-নির্ভর ভূম্যধিকারীশ্রেণী, দেশী ব্যবসাদার ও মুৎসুদ্দি, এবং রামমোহনের মত শিক্ষাদীক্ষা জ্ঞান-অধ্যয়নে অগ্রচারী বুদ্ধিজীবীদের রাজনৈতিক ও সামাজিক ভূমিকা সম্পর্কে তৎকালীন ইংরেজ রাজপুরুষ, কোম্পানী কর্তৃপক্ষ প্রভৃতির কোন সন্দেহ ছিল না—পূর্বোক্ত ভারতীয়দের তাঁরা তাঁদের শাসন শোষণ-ব্যবস্থাদির বাহনরূপে ব্যবহার করছিলেন এবং করতে কৃতসংকল্পও ছিলেন। রাজা রামমোহন যখন বিলেত যান, তখন তাঁর প্রতি যে সম্মাননা, সম্মানার্থ যে সব প্রীতিভোজ, রাজপরিবারের ব্যক্তিদের সহিত মেলামেশা এবং ইংলণ্ডেশ্বরের মুকুটধারণ উৎসবে বিশিষ্ট রাজপ্রতিনিধিদের মধ্যে আসনদানের যে ব্যবস্থা (৩) তা যে সুপরিকল্পিত এবং গভীর উদ্দেশ্যমূলক তা বুঝতে বিন্দুমাত্রও কষ্ট হয় না। অন্যান্য ভারতীয়রাও রাজা রামমোহনের মত বিলেত যাবে এবং শাসিত ও শাসকের সম্পর্ককে

(৩) সংবাদপত্রে সেকালের কথা, ২য় খণ্ড, ৪৭৭-৪৮৮ পৃষ্ঠায় বিলাতে রাজা রামমোহনের আদর-আপ্যায়নের সংবাদ পাওয়া যাবে।

ঘনিষ্ঠতর করবে, কেহ কেহ এ আশাও ব্যক্ত করেছিলেন। ভারতের সামাজিক, রাজনৈতিক ও রাষ্ট্রনৈতিক জীবন যে ধারায় প্রবাহিত ও বিবর্তিত হ'য়েছে, ইংরেজ এবং ইঙ্গ-ভারতীয় সম্পর্ককে স্থায়ী ও নিকটতর করার জন্য রামমোহন ও অন্যান্য ভারতীয়রা যা করেছেন, তার সামগ্রিক বিচারে তাঁদের পক্ষে ইংরেজ শাসনব্যবস্থার বাহনরূপে ব্যবহৃত হওয়া ছাড়া গত্যন্তর ছিল না।

রামমোহন যে ভাবরাশিতে ও কর্মে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন, তা ছাড়া সে সময়ে অন্য কোন কর্ম সম্ভব ছিল কিনা, ভারতের সমাজবিবর্তন অন্য ভাবে হ'তে পারত কি পারত না, সে সমস্যার বিচার বা সে সম্পর্কে বাদানুবাদ আজ নিষ্ফল ও অবাস্তব। যা হয়ে গিয়েছে, তা আমাদের নিকট বাস্তব সত্য, ইতিহাস; ইতিহাসকে ব্যাখ্যা করা চলে, বদলানো যায় না। সেই ইতিহাসের প্রবাহ-ধারায় অবগাহন করে আজ আমরা নিঃসন্দেহে ঘোষণা করতে পারি যে, রামমোহন ও তাঁর সমসাময়িক প্রাগ্রসর ভারতীয়রা যা করেছেন, ইতিহাসের বিচারে তা যথার্থ; কেননা, কালের অন্তর-প্রেরণাকেই তাঁরা যথাসাধ্য রূপ দিয়েছিলেন।

ইতিপূর্বে আমরা দেখেছি, ইংরেজ-বিজয় অজ্ঞাতসারে ভারতে সমাজ-বিপ্লব সংসাধিত করে চলছিল। সেই সমাজ-বিপ্লব অবশ্য ভারতের দরিদ্র জনসাধারণের নিকট উপস্থিত কোন সুখস্বাচ্ছন্দ্য অথবা আর্থিক আরাম নিয়ে আসেনি, কিন্তু তথাপি তা ছিল নতুন বিকাশধারার সম্ভাবনায় ও প্রতিশ্রুতিতে পরিপূর্ণ। রামমোহন তাঁর অনন্যসাধারণ প্রতিভা দ্বারা এই সম্ভাবনার তাৎপর্য উপলব্ধি করেছিলেন, এবং তাকে হৃদয়ে গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর ব্যবহারিক কর্ম, আচরণ এবং আবেদন-নিবেদনের মাধ্যমে তিনি নিয়ত কামনা করেছিলেন ঐ প্রতিশ্রুতির বাস্তব রূপায়ণ। ঐ প্রতিশ্রুতি ও সম্ভাবনার সঙ্গে জড়িত ছিল যে অশ্রু-

বেদনা ও সাম্রাজ্যলোভী অত্যাচার, তার উপর রাজা রামমোহনের কোনও হাত ছিল না।

তাছাড়া, দেশে ইংরেজ শাসন প্রবর্তিত হওয়ায় পর ভারতের সামাজিক উন্নতি ও সমৃদ্ধির জন্য সর্বপ্রথম আবশ্যক ভারতের রাজনৈতিক ঐক্য। শুধু উন্নতি অথবা সমৃদ্ধি কেন, কোনদিন যদি ভারতবর্ষকে পুনরায় স্বাধীনতা অর্জন করতে হয় এবং পরাধীনতার বন্ধন ছিন্নভিন্ন করতে হয়, তাহলে এই রাজনৈতিক ঐক্যই হবে সর্বপ্রথম ভিত্তি। বৃটিশ শাসনব্যবস্থায় ভারত ইতিমধ্যেই ঐক্যবদ্ধ হয়ে গিয়েছে বা হওয়ার পথে। সুতরাং বৃটিশ শাসনের সহায়ক হওয়ার পরোক্ষ অর্থ সেই ঐক্যের সহায়ক হওয়া, এবং বৈষয়িক উন্নতির পথ নির্মাণ করা। পরবর্তীকালে মার্ক্স যে বলেছিলেন (৪) বৃটিশ বুর্জোয়ারা ভারতে নতুন সমাজের যে বীজ বপন করেছে, তার পাকা ফসল ভারতীয়রা কখনও আহরণ করতে পারবে না ·····যদি না কোনদিন তারা বৃটিশ শাসন-ব্যবস্থা উচ্ছেদ করার শক্তি অর্জন করে, রামমোহনের অসামান্য সমাজ-সচেতন বোধ-বুদ্ধি চিন্তা ও কর্মের মধ্যে সেই শক্তি অর্জন করার বীজ নিহিত ছিল। ভারতে ইংরেজী শিক্ষাদীক্ষা, বৃটিশ আইন ও সামাজিক বিধান, যুক্তিবাদ ইত্যাদির চর্চা আলোচনা এবং প্রসারে অগ্রগামী হয়ে রামমোহন পরবর্তীকালের ভারতীয়দের মানসিক উন্নতি ও শক্তিসাধনার পথই নির্মাণ করে গিয়েছেন। তার মধ্যে চিন্তা বুদ্ধি ও উপলব্ধির যে বলিষ্ঠতা, অন্যায়ের প্রতি যে ঘৃণা, ন্যায়বিচারের যে আগ্রহ, তা-ই পরবর্তীকালে বৃটিশ-বিরোধী আন্দোলনে পরিণত হয়েছে।

সুতরাং প্রত্যক্ষত বৃটিশ শাসনের বাহন হলেও, এবং তাঁর কর্ম ও

(৪) Future Results of British Rule in India.

চিন্তার মাধ্যমে পরোক্ষে বৃটেনের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থ হলেও, তাঁর কর্ম সর্বতোভাবে ইতিহাসের ধারার সঙ্গে সংযুক্ত ছিল।

॥ ৫ ॥

রামমোহন অনুভব করেছিলেন, অন্তত ব্যবহারিক রাজনৈতিক সুবিধাদির জন্য হলেও হিন্দুদের ধর্মবিশ্বাসে পরিবর্তন আসা উচিত। তার উপর তাঁর মানস-জীবন গড়ে উঠেছে একেশ্বরবাদী ইংরেজ ও মুসলমান রাজকর্মচারী ও পণ্ডিতদের সাহচর্যে ; বৃটিশ দার্শনিক বেন্থামের তিনি ছিলেন অনুরাগী ভক্ত, বিলেতে বেন্থামের সঙ্গে সাক্ষাৎকারও হয়েছিল তাঁর ; সম্ভবত ভলটেয়ার-সাহিত্যের সঙ্গেও তাঁর পরিচয় ছিল।(৫) ব্যবহারিক চেতনা থেকেই হোক অথবা সত্যানুসন্ধানের ফসলরূপেই হোক অথবা দু'য়ের সংমিশ্রণের ফলেই হোক, রামমোহন ব্যক্তিগত জীবনে নতুন ধর্মমত আশ্রয় করেছিলেন। ঈশ্বর এক কি বহু, ঈশ্বর আছেন কি নেই, ইত্যাদি প্রশ্নে ও তর্কবিতর্কে আধুনিক কালের মানুস আর বিব্রত হয় না ; তাই ধর্মমতের দার্শনিক বিচার নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু, রাজা যে ধর্মমতে উপনীত হয়েছিলেন তা যে সেকালের সামাজিক পরিবেশে ব্যবহারিক জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ও যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, তা নিঃসন্দেহ। তা ব্যবহারিক রাজনৈতিক সুবিধাদি এনে দিক বা না দিক, মত ও ভাবরাশির দিক থেকে তা যে খৃষ্টান ইংরেজ ও মুসলমান মৌলবীকে রামমোহন ও তাঁর পরিজনদের নিকটতর করেছে, তাও

---

(৫) রামমোহন স্থাপিত 'এ্যাংলো হিন্দু স্কুলে' ছাত্রদের ভলটেয়ারের বই থেকে বাংলা তর্জমা করতে দেওয়া হতো।—প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় ; 'দেশ' ৫ই অগ্রহায়ণ, ১৩৬০ সাল।

নিঃসন্দেহ। মানুষের মানস-প্রকরণের বৈশিষ্ট্য এই, যতোই সে তার আপন সংকীর্ণ সীমা লঙ্ঘন করে, বহু জাতের বহু মানুষের সাহচর্যের মাধ্যমে সমস্ত মানুষের মধ্যে ক্রিয়াকর্ম, স্নেহ মমতা, অনুভূতি ও হৃদয়বৃত্তির ঐক্য ও মিল অনুভব করে, ততোই সে বিরোধ উত্তীর্ণ হয়, ততোই সমগ্র মানবজাতির ও তাদের সৃষ্টিকর্তার একত্বে সে নিঃসংশয় হয়। সমগ্র মানুষ যখন এক, তখন তাদের সৃষ্টিকর্তাও এক; অথবা সৃষ্টিকর্তা এক ও অভিন্ন বলেই সমগ্র মানুষ এক—এমনি ধরণের চিন্তার উদ্ভব হয়।

রামমোহনের ক্ষেত্রে এই চেতনা ছাড়াও, তাঁর নিরাকার ব্রহ্মোপাসনা ছিল মানুষের সঙ্গে মানুষের মিলনের মন্ত্র। তাঁর লক্ষ্য ছিল বাংলা তথা ভারতের গণ্ডী অতিক্রম করে বিশ্ব-সীমানায় উপনীত হওয়া। তাঁর কথা, 'এই হিন্দোস্থান ভিন্ন অর্দ্ধেক হইতে অধিক পৃথিবীতে এক নিরঞ্জন পরব্রহ্মের উপাসনা লোকে করিয়া থাকেন এই হিন্দুস্থানেতেও শাস্ত্রোক্ত নির্ব্বাণ সম্প্রদা এবং নানক সম্প্রদা আর দাদূ সম্প্রদা এবং শিবনারায়ণী প্রভৃতি অনেকে কি গৃহস্থ কি বিরক্ত কেবল নিরাকার পরমেশ্বরের উপাসনা করেন তবে কিরূপে কহেন যে তাবৎ পৃথিবীর মতের বহির্ভূত এই ব্রহ্মোপাসনার মত হয়।.........এতদ্দেশীয়েরা যদি অনুসন্ধান আর দেশ ভ্রমণ করেন তবে কদাপি এই সকল কথাতে...... বিশ্বাস করিবেন না। আমাদিগ্যের উচিত যে শাস্ত্র এবং বুদ্ধি উভয়ের নির্দ্ধারিত পথের সর্ব্বথা চেষ্টা করি এবং ইহার অবলম্বন করিয়া ইহলোক পরলোকে কৃতার্থ হই।" (৬)

তিনি যে ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করেছিলেন, তা সাম্প্রদায়িক গন্ধবিমুক্ত

---

(৬) রামমোহন গ্রন্থাবলী; পৃষ্ঠা ১১

ছিল। তাঁর নির্দেশ ছিল, কোন সাম্প্রদায়িক নামে পরব্রহ্মের উপাসনা চলতে পারবে না। জাতি, ধর্ম, সম্প্রদায় এবং সামাজিক প্রতিষ্ঠা নির্বিশেষে সমস্ত ভক্তের জন্যই ব্রাহ্মসমাজের দ্বার উন্মুক্ত থাকবে। আর যুক্তির প্রতি নিষ্ঠা ও মানবিক বোধ তাঁর এতোই প্রবল ছিল যে তিনি ঘোষণা করেছিলেন, 'এরূপ স্ত্রীবধেতে একদেশীয় লোকের কি কথা? যদি তাবৎ দেশের লোক ঐক্য হইয়া করে, তথাপি বধকর্তারা পাতকী হইবেক, অনেক ঐক্য হইয়া বধ করিয়াছি, এই কথার ছলে ঈশ্বরের শাসন হইতে নিষ্কৃতি হইতে পারে না।' (৭) সহমরণ প্রথার অযৌক্তিকতা প্রতিপন্ন করতে গিয়ে তিনি যুক্তিবাদের প্রতি যে অনুরাগ, স্ত্রীজাতির প্রতি যে মমত্ববোধ এবং তাদের সামাজিক অধিকারাদি সম্পর্কে যে গভীর আগ্রহ, সর্বোপরি যে সুমহান মানবিক বোধের পরিচয় দিয়েছেন, তাতে বিস্ময়াবিষ্ট হতে হয়। প্রায় দেড়শ' বছরের পরবর্তী-কালের মানুষ আমরা; আমাদের নিকট এ-কাজ নিতান্তই তুচ্ছ বলে বোধ হয়; কিন্তু রামমোহনের আমলে মানুষের বুদ্ধি যখন ছিল স্বৈরাচারী দেশাচার আর কুসংস্কারের নিকট বিক্রীত, তখন তার বিরোধিতা করা যে কতো বড় দুঃসাহসিক কাজ তা আজ কল্পনা করাও কঠিন। এই বিরোধিতায় কোন কর্দম ছিল না; তাঁর প্রতিপক্ষ সনাতনপন্থী হিন্দুরা যখন তাঁর বিরুদ্ধে কুৎসিৎ ভাষা প্রয়োগ করছেন তখনও তিনি অবিচল নিষ্ঠায় শাস্ত্রবচন উদ্ধৃত করে প্রতিপক্ষের যুক্তি খণ্ডন করছেন, আর বলছেন, 'হে সর্বব্যাপী পরমেশ্বর, তুমি আমাদিগ্যে হিংসা মৎসরতা মিথ্যাপবাদে প্রবর্ত করাইবে না ওঁ তৎসৎ।' হৃদয়ের এই প্রশস্ততা দুর্লভ। আধুনিক কালে রামমোহনই বোধ করি প্রথম যিনি স্ত্রীজাতিকে

(৭) রামমোহন গ্রন্থাবলী; 'প্রবর্তক ও নিবর্তকের দ্বিতীয় সম্বাদ'

ভোগ্য বস্তুর স্তর থেকে মানুষের পর্যায়ে নিয়ে এসেছেন, এবং তাদের সামাজিক অধিকারাদি নিয়ে সংগ্রাম করেছেন।

দুঃসাহসের অভিযাত্রী রামমোহন শুধুমাত্র ধর্মমতের দিক থেকেই নয়, রাজনৈতিক চিন্তাধারা, যুক্তি ও আদর্শের দিক থেকেও বিশ্ব-মানবের সঙ্গে মিলিত হ'তে চেয়েছিলেন। ১৮২১ সালে নেপল্‌সের নিয়মতান্ত্রিক গভর্ণমেণ্ট যখন অষ্ট্রীয় সৈন্যদের আক্রমণে পরাজিত হয়, তখন বিমর্ষ হয়ে রামমোহন 'ক্যালকাটা জারনাল'-এর সম্পাদক বাকিংহামের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎকার বাতিল করে এক পত্রে লিখেছিলেন, 'I consider the cause of the Neapolitans as my own, and their enemies as ours.' তেমনি, দক্ষিণ আমেরিকার উপনিবেশগুলি স্বৈরাচারী স্পেনের উৎপীড়ন থেকে যখন মুক্ত হয়, রাজা সেই বিজয়-উৎসব পালনের জন্য কলকাতায় একটি ভোজ দেন। ভোজ কেন দিচ্ছেন, জিজ্ঞাসিত হ'য়ে রাজা উত্তর করেন 'What! ought I to be insensible to the suffering of my fellow-creatures wherever they are, or however unconcerned by interests, religion or language?' দ্বিতীয় ফরাসী বিপ্লবের সাফল্যে (১৮৩০) তিনি আনন্দিত হ'য়েছিলেন, এবং বিলাতযাত্রার পথে কেপটাউনে ফ্রান্সের জাতীয় পতাকাবাহী দুইটি ফরাসী জাহাজ দেখে শারীরিক অসুস্থতা সত্ত্বেও তিনি ফরাসী জাতির প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা নিবেদন করে এসেছিলেন; বৃটিশ পার্লামেণ্টে 'রিফর্ম বিল' যদি পাশ না হয় তা'হলে ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে কোন সংস্রব রাখবেন না বলে সংকল্প করেছিলেন; ফ্রান্স-ভ্রমণের ছাড়পত্র প্রার্থনা করে তিনি যে দরখাস্ত করেছিলেন, তাতে নির্ভয়ে ঘোষণা করেছিলেন, 'all mankind are one great family of which numerous nations and tribes existing

are only various branches' (৮)। শুধু তাই নয়, মনীষাবলে তিনি উপলব্ধি করেছিলেন, ভারতে জাতীয়তাবাদ কখনও সত্যিকারের সাফল্য অর্জন করবে না, যতক্ষণ না পশ্চিমের জাতিগুলি প্রকৃত স্বাধীনতা অর্জন করে। সর্ববিধ সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দাসত্বমুক্ত পৃথিবীর স্বাধীন জাতিগুলি তখন একই আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে ঐক্যের বন্ধন সৃষ্টি করবে। যাঁর মানসপট ছিল এমনি চিন্তা ও চিত্রে উদ্ভাসিত, তাঁর মনের বিশালতা যে কতো সর্বগামী, ইতিহাসের গতিপ্রবাহের চেতনা যে কতো গভীর, রাজনৈতিক দূরদৃষ্টি যে কতো সুদূরপ্রসারী, এবং মানসিক বোধ যে কতো প্রখর ছিল, তা ভাষায় ব্যক্ত করা কঠিন। আর এ মনোভাবের পরিচয় দিয়েছেন তিনি সে আমলে, যখন তাঁর স্বদেশবাসীরা ছিলেন অজ্ঞানতমিস্রায় নিমজ্জিত, যখন সামাজিক অনাচার মনের বিকাশকে রুদ্ধ করে রেখেছিল, যখন পৃথিবী সম্পর্কে দূরে থাক, ভারতবর্ষ সম্পর্কেই কোন আগ্রহ তাঁর দেশবাসীর জাগেনি।

তাঁর সমকালীন বাঙ্গালীরা তাঁর কর্ম ও চিন্তার সার্বভৌম স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারেনি, অথবা উপলব্ধি করার মতো মেধা ও বুদ্ধি তাদের ছিল না। তাই রাজার একান্ত বাহ্য আচরণকে অবলম্বন করে তারা তাঁকে নিন্দিত ও লাঞ্ছিত করার চেষ্টা করেছে। কিন্তু, তাতে রাজার কর্ম ও চিন্তা ক্ষুণ্ণ হয়নি। পূর্বে কালের যে অন্তর-প্রেরণার কথা উল্লেখ করেছি, তার উপলব্ধি রামমোহনের মনে সর্বদা জাগ্রত ছিল বলেই তাঁর কর্ম, চিন্তা ও ভাবরাশির মধ্যে আমরা অনুভব করি অবিরাম গতির চঞ্চলতা। তিনি যেন অরুণোদয়ের স্পর্শলাভ করেছেন, এবং তারই সন্ধানে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়তে চেয়েছেন পৃথিবীর পথে। ভারতের মধ্যযুগের

---

(৮) রামমোহন রায়—ব্রজেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

গ্রাম-কেন্দ্রিক সমাজ ও সংস্কৃতি মানুষকে গ্রামের সীমানার মধ্যে আবদ্ধ করে রেখেছিল ; তাই সেকালের জীবন ছিল জলাশয়ের মত নিশ্চল, নিস্তব্ধ। ইংরেজ বণিকের কামানবন্দুক সে নিস্তব্ধতা ভেঙে দিয়েছে, আর তার যন্ত্র-চালিত সভ্যতা এনেছে গতি ; সেই গতি ভারতের সুদূর প্রান্তবর্তী গ্রামকে বেঁধে দিয়েছে ল্যাঙ্কাশায়ারের মেসিনের সঙ্গে। ধ্বংসের ভেতর দিয়ে ইংরেজ সৃষ্টি করছিল বাইরের দিক থেকে ; রামমোহন সৃষ্টি করছিলেন ভেতরের দিক থেকে (১)। বাংলাদেশে যুক্তিবাদী চিন্তাধারার প্রবর্তন করে এবং কুসংস্কারাদির প্রতিবাদ ও সামাজিক ন্যায়বিচারের দাবী জানিয়ে তিনি ও তাঁর সহধর্মী বন্ধুগণ বাংলা তথা ভারতের মানস-জীবনে সেই গতির সঞ্চার করেছিলেন যা জীর্ণ পুরাতনকে অস্বীকার করবে, ভাঙবে, এবং নবীন আদর্শে নতুনকে সৃষ্টি করবে। সংস্কৃতের পরিবর্তে ইংরেজী শিক্ষার আন্দোলনের মধ্যেও সমাজ-জীবনে সেই গতি ও প্রাণশক্তি সৃষ্টির চেষ্টা, যা অচিরে বিশ্বের জ্ঞানবিজ্ঞান আহরণ করে ভারতবর্ষকে পৃথিবীর অন্যান্য প্রাগ্রসর দেশের সমপর্যায়ে টেনে আনবে। তাঁর কর্ম, চিন্তা ও ধ্যান ভারতের সমাজকে গতি দান করেছে। ইংরেজ-শাসন ভারতকে ঐক্যবদ্ধ করে যে নতুন বিকাশপথে পরিচালিত করে দিয়েছিল, রামমোহন তার উপযোগী সমাজ-মানস সৃষ্টি করে সে বিকাশধারাকে সফল করতে চেয়েছিলেন।

এমনিভাবেই কালের অন্তর-প্রেরণা ব্যক্তিবিশেষের কর্ম ও ধ্যানের ভিতর দিয়ে সার্থক হ'য়ে ওঠে।

---

(১) স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, সে-কালে ইংরেজ সংসাধিত সমাজ-বিপ্লবের ক্ষতি ও দুঃখের বোঝা বহন করা ছাড়া ঐ বিপ্লবে ভারতের শ্রমজীবী জনসাধারণের আর কোন ভূমিকা ছিল না। বিপ্লবের নায়ক ছিল ইংরেজ আর অংশীদার ইংরেজ-সৃষ্ট ও ইংরেজ-নির্ভর নতুন ভূম্যধিকারী শ্রেণী, দেশী বণিকদল ও বুদ্ধিজীবীরা।

॥ ৬ ॥

রামমোহন তাই নতুন মানুষ। পূর্বতন সমাজ ও সমাজ-সম্পর্কের মধ্যে তাঁর সাক্ষাৎ পাওয়া যাবে না, অথবা পূর্বতন-সমাজ-আশ্রয়ী ভাবধারার সঙ্গেও তাঁর কণ্ঠস্বর মিলবে না। কারণ, নতুন সমাজ-বিপ্লবের অন্তর ভেদ করে তিনি আবির্ভূত হয়েছেন—তিনি নতুন, তিনি অভিনব। সেই সমাজ-বিপ্লবের যেটুকু সৃষ্টির দিক, তার ঐশ্বর্যই রামমোহনের ভিতর দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে। ইংরেজের মতই কণ্ঠে তাঁর নতুন বাণী, তেজ, বীর্য, শক্তি ও সাহস। কর্মে তাঁর তেমনি সজীবতা, তেমনি প্রাণ, তেমনি গতি। অবশ্য, তাঁর আচরণে স্ব-বিরোধ যে সম্পূর্ণ অনুপস্থিত তা নয়,—সর্বপ্রকার অত্যাচার উৎপীড়নের বিরোধী হওয়া সত্বেও কোন কোন ক্ষেত্রে এ-দেশবাসী ইংরেজের অত্যাচারকে তাঁর সমর্থন করতে হয়েছে। যেমন নীলকর সাহেবদের ক্ষেত্রে। কিন্তু, জীবনের সামগ্রিক বিচারে এ নিতান্তই তুচ্ছ। তিনি নতুন তৈরী-হতে-থাকা সামজের সন্তান, তার সবটুকু অভিনবত্ব নিয়েই আবির্ভূত হয়েছেন।

এই স্ববিরোধ বাদ দিয়ে তাঁর চরিত্রকে বোঝা যাবে না, অথবা ভুল বোঝা যাবে। আর তাঁকে ভুল বোঝার অর্থ তিনি ও তাঁর সহমরমীদের কর্মের মাধ্যমে যে ভারতের সৃষ্টি হয়েছে, তার সাংস্কৃতিক বিকাশধারাকে ভুল বোঝা। এই স্ববিরোধের মধ্যেই ভারত-ইতিহাসের ডাইলেকটিকসের রহস্য। সেই ডায়লেকটিকসের ভবিষ্যৎ পরিণতির দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেই রামমোহন ও অন্যান্যদের কর্মের বিচার করতে হবে।

সেকালের একটি রসরচনায় তাঁর স্বরূপটি সুন্দর ব্যাখ্যা করা হয়েছিল।

১৮৩০ সালের গোড়ার দিকে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সনদ ও

ভারতের ভবিষ্যৎ শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে বিলেতে যখন আলোচনা চলছিল, তখন জনৈক কৌতুক-নাট্য রচয়িতা 'ভারত শাসন পরিকল্পনা—একটি নাটক' নামে একটি রসরচনা প্রকাশ করেন। ঐ নাটকে পার্লামেণ্টে নির্বাচনপ্রার্থী একটি চরিত্রের মাধ্যমে রচয়িতা বলছেন, রাজা রামমোহন রায়কে ভারতের গভর্ণর জেনারেল করা হোক; বিচারবিভাগের সমস্ত পদ মুসলমানদের দেওয়া হোক, রাজস্ববিভাগের পদগুলি হিন্দুদের, এবং পুলিশের পদগুলি বৃটন বা ইঙ্গভারতীয়দের দেওয়া হোক। তারপর রচয়িতা বলছেন, 'The beauty of this plan, ladies and gentlemen, consists in this: the Raja is neither a Hindoo, a Mahomedan, nor a Christian, so that he can have no bias towards any part of the population of India.' (১০) ব্যঙ্গ চিত্র হলেও এ'তে একটি অতীব সত্য কথা বর্ণিত হয়েছে,—রাজা রামমোহন হিন্দু নয়, মুসলমান নয়, খৃষ্টানও নয়, তিনি সর্বাগ্রে মানুষ। এই মানুষ জাতিধর্মবর্ণ ও সংস্কারের উর্ধ্বে; সে সর্বগামী। এই মানুষই নতুন ভারতের নতুন মানুষ।

ইতিপূর্বে যে আলোচনা করা হয়েছে, তাতে আমরা দেখেছি যে, ইংরেজের সাম্রাজ্যিক স্বার্থই পরোক্ষে এই মানুষকে সৃষ্টি করেছিল। কিন্তু, ইংরেজ রাজপুরুষ ও সাম্রাজ্যবাদ এই মানুষকে তার প্রয়োজন সিদ্ধির সীমার মধ্যে আবদ্ধ করে রাখতে চেয়েছিল। তাঁরা তাকে চেয়েছিলেন শুধু স্বার্থবাহী পশুরূপে। কিন্তু, সমাজ-প্রবাহের নিয়মই এই

(১০) Asiatic Journal, 1832, Jan-April থেকে শ্রীবিমান বিহারী মজুমদার তাঁর History of Political Thought গ্রন্থে উদ্ধৃত করেছেন।

যে, কোন সামাজিক ক্রিয়াকেই তার উপস্থিত গরজের সীমায় আটকে রাখা যায় না, তার ফল সুদূরপ্রসারী হয়। প্রকাশিত না হওয়া পর্যন্ত কোন বাণী বা কথার, এবং অনুষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত কর্মের এক রূপ—তখন পর্যন্ত সেটি ব্যক্তি বা কর্তার ইচ্ছা অনিচ্ছার সীমায় আবদ্ধ। কিন্তু প্রকাশিত বা অনুষ্ঠিত হওয়ার পর তার আরেক রূপ—তখন সে সামাজিক, সামাজিক ঘাতপ্রতিঘাত লেনদেনের বাজারে বিস্তৃত। প্রথম অবস্থায় তার উপর কর্তার শাসন চলে। কিন্তু দ্বিতীয় অবস্থায় সামাজিক পরিসরে ছড়িয়ে পড়ার পর কর্তার শাসন অচল। সামাজিক সম্পর্ক থেকে নতুন নতুন তাৎপর্য, উপযোগিতা ও গতি আহরণ করে সে নতুন পথে বিকশিত হয়, বিকাশের পথে নতুন সম্ভাবনা নিয়ে আসে। বৃটিশ পণ্য চলাচলের সুবিধার জন্য ইংরেজ ভারতে অনিচ্ছা সত্বেও যে শিল্পপ্রসারে বাধ্য হয়েছে, তার পরিণাম যেমন ইংরেজের উদ্দেশ্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি, তেমনি ইংরেজ-স্বষ্ট ও ইংরেজ-নির্ভর নবীন ভারতীযরাও শুধুমাত্র ইংরেজ-নির্দিষ্ট পথেই বিচরণ করেননি। যাঁদের স্বষ্টি হয়েছিল ইংরেজের সহায়তার জন্য, তাঁরাই পরবর্তী কালের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের জনক, তাঁদের একজনের কণ্ঠ থেকেই একদিন ঘোষিত হয়েছিল, 'স্বাধীনতার শত্রু ও স্বৈরাচারের মিত্ররা পরিণামে কোনদিন জয়লাভ করেনি, এবং কোনদিন করবেও না।'

এই মানুষের আবির্ভাবের জন্য কাল জমি প্রস্তুত করে রেখেছিল। বিশাল ভারতের কোন না কোন স্থানে তাঁর আবির্ভাব হতোই। আমাদের পরম সৌভাগ্য যে, তাঁর আবির্ভাব হয়েছিল আমাদেরই বাংলাদেশে। রামমোহন তাঁর সমকালীন বাংলা ও বাঙ্গালী সম্পর্কে সম্ভবত গর্ববোধ করতে পারতেন না, পারার সঙ্গত কোন কারণও ছিল না। স্বষ্টির সেই চঞ্চল মুহূর্তে একদল বাঙ্গালী যে মনোবৃত্তির পরিচয় দিয়েছে তাতে

লজ্জিত হওয়ার কারণও আছে, কিন্তু, পরবর্তী কালের বাংলা ও বাঙ্গালী তাঁর জন্য গর্বিত ; শুধু বাঙ্গালী হিসেবেই নয়, এইজন্যে যে তাঁর মধ্যেই সর্বপ্রথম আধুনিক ভারতের কণ্ঠস্বর শোনা গিয়েছিল। বোধবুদ্ধি ও মননের ক্ষেত্রে তিনি যে শক্তির পরিচয় দিয়েছেন, তা আজও দুর্লভ। তিনি কোন কাজ সর্বাগ্রে করেছেন, কোন কাজ সর্বাগ্রে করতে পারেননি, সন তারিখের এই মূঢ় বিচারে তাঁর প্রতিভা ও অবদান খর্ব করার চেষ্টা শুধু অপচেষ্টা নয়, বাতুলতা। তার চেয়েও বড় কথা, জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারেই হোক, যুগের অন্তর-প্রেরণাকে কে কতো বেশী আয়ত্ত করেছেন এবং কার কর্ম চিন্তা ও আদর্শের মধ্য দিয়ে ইতিহাস আপনাকে সৃষ্টি করেছে। সেখানে রামমোহন সর্বাগ্রচারী। শুধু তাই নয়, তিনি একক, অনন্য।

বাংলা সমাজবিপ্লবে বিদ্যাসাগর

॥ ১ ॥

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ১৮২৯ সালে যখন ব্যাকরণের তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্ররূপে কলকাতার সংস্কৃত কলেজে প্রবেশ করেন, কলিকাতা তখন হিন্দু কলেজের ছাত্রদের চলনবলন, আচার-আচরণ, বিদ্যাবুদ্ধি চিন্তা ও কটুগন্ধী ভাবধারার দৌরাত্ম্যে আশা-আতঙ্ক-বিস্ময় অথবা একান্ত নিন্দা অথবা প্রশংসায় উত্তপ্ত।

বৃটিশ ঔপনিবেশিক শাসনব্যবস্থার সামাজিক প্রতিক্রিয়া এই সবে ফলতে আরম্ভ করেছে। রামমোহন ও তাঁর কর্মীবন্ধুরা বিধাতার আশীর্বাদ এই বৃটিশ বিজয়ের সামাজিক স্বীকৃতির পথ সুগম করে রেখেছিলেন; বৃটিশ ভূমিব্যবস্থা ও বাণিজ্যিক আদানপ্রদান ভারতে ইতিমধ্যেই ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদের বাহন সৃষ্টি করে রেখেছিল। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী-নির্ভর এই ব্যক্তিদের মধ্যে যাঁদের মন ছিল কল্যাণ-ধর্মিতার আদর্শে উজ্জ্বল এবং ইতিহাস-বোধে সজীব, তাঁরা বৃটিশ বিজয়ে ভারতের আত্মিক ও বৈষয়িক উন্নয়নের সম্ভাবনাকে চিরস্থায়ী করার জন্য বাস্তব কর্মে ব্রতী হয়েছিলেন। সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধির পথ, ইংরেজী শিক্ষার প্রচলন ও শিক্ষার মাধ্যমে ইংরেজ-আনীত ভাবরাশির প্রসার।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ প্রথম দিকে ভারতীয়দের ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত করার পক্ষপাতী ছিলেন না; কারণ, তাঁদের অনেকেরই এই আশঙ্কা ছিল যে, ইংরেজী ভাবাদর্শে উদ্বুদ্ধ ভারতবর্ষ কোন এক কালে আমেরিকার মত বৃটেনের হাতছাড়া হয়ে যাবে। তাঁরা বরং

খৃষ্টান পাদ্রীদের ধর্মপ্রচারে আর্থিক সহায়তা করার পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু কোম্পানী কর্তৃপক্ষের অনিচ্ছা এবং ব্যবহারিক বিরোধিতা সত্ত্বেও খৃষ্টান মিশনারীদের আনুকূল্যে, দেশীয় সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের অর্থ সাহায্যে এবং কিছু সংখ্যক মহানুভব ইংরেজ সিভিলিয়ান ও নাগরিকের সক্রিয় প্রচেষ্টায় শ্রীরামপুর ও কলকাতাকে কেন্দ্র করে ইংরেজী শিক্ষার প্রচলন হয়। হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮১৭ সালে, ভারতের তৎকালীন রাজনৈতিক-সামাজিক পরিবেশে ইংরেজী শিক্ষার যৌক্তিকতা প্রমাণ করে রামমোহন লর্ড আমহার্ষ্টকে যুগান্তকারী পত্র লেখেন ১৮২৩ সালে, এবং তাঁর ও অন্যান্যদের ব্যক্তিগত স্বতন্ত্র প্রচেষ্টায় ঐ সময়ে আরও দু'চারটি ইংরেজী স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়।

কালক্রমে কোম্পানী-কর্তৃপক্ষও তাঁদের শিক্ষাসংক্রান্ত মতবাদ পরিবর্তনে বাধ্য হন। ইংরেজের ন্যায়শাস্ত্রাদির সার্বভৌম আদর্শে মোহিত হয়ে রামমোহন যে-সব রাজকার্যের পশ্চাতে লক্ষ্য করেছেন ইংরেজের মহানুভবতা, নিরপেক্ষ বৈজ্ঞানিক ইতিহাস সেখানে আবিষ্কার করে অর্থনৈতিক ও সাম্রাজ্যলোভী স্বার্থসিদ্ধির আত্যন্তিক চেতনা। এই চেতনাই মত- পরিবর্তনের অন্যতম প্রধান কারণ। লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক ১৮২৮ সালে গভর্ণর জেনারেলরূপে ভারতে আসার পূর্বে কোম্পানীর ব্যয়বরাদ্দে প্রতি বৎসরই বিস্তর টাকা ঘাট্তি পড়তো। তাঁর আগমনের অব্যবহিত পূর্ববর্তী দু'বৎসর গড়পড়তা বাৎসরিক ঘাটতির পরিমাণ ছিল ৩০ লক্ষ পাউণ্ড। কর্মভার গ্রহণের পর তিনি ব্যয়সঙ্কোচের প্রতিমনোনিবেশ করেন এবং তাঁর শাসনকালে পূর্বোক্ত ঘাটতি ক্রমে ২০ লক্ষ পাউণ্ড উদ্বৃত্তে পরিণত হয়। ব্যয়সঙ্কোচকল্পে তিনি শিক্ষাদীক্ষা যোগ্যতা ও নির্ভরশীলতা ভেদে অধিকাংশ নিম্নতর পদে ভারতীয়দের নিয়োগের পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁর চিন্তায় বৃটেনের অর্থ-

নৈতিক স্বার্থের চেতনা, এবং কিঞ্চিৎ পরবর্তীকালে তাঁর আইনসচিব লর্ড মেকলের চিন্তাধারায় বৃটেনের রাজনৈতিক স্বার্থের চেতনা অত্যন্ত পরিষ্কার-রূপে অভিব্যক্ত হয়। বর্তমান সামাজিক. রাজনৈতিক ও রাষ্ট্রনৈতিক পরিবেশে এ-দেশবাসীদের শিক্ষাদীক্ষা ইংরেজীর মাধ্যমেই হওয়া উচিত, এই মতবাদ প্রতিষ্ঠায় মেকলে অবশ্য এ-দেশবাসীকে তাদের অভাবনীয় বর্বরতা ও অধঃপতনের কবল থেকে মুক্ত করে সভ্যতার আলোকতীর্থে নিয়ে যাওয়ার কথা গর্বভরে উল্লেখ করেছেন, তথাপি একথা বিবৃত করতেও তিনি বিস্মৃত হননি যে, ইংরেজী শিক্ষার মাধ্যমে এদেশে এমন একদল লোক সৃষ্টি করতে হবে যারা শুধুমাত্র রক্ত আর বর্ণের পরিচয়ে ভারতীয়, কিন্তু শিক্ষাদীক্ষা চলনবলন সংস্কারসংস্কৃতিতে হ'বে খাঁটি ইউরোপীয়, যারা শাসক আর শাসিতের মধ্যে শুধু সেতুবন্ধের মত বিরাজ করবে। সুতরাং একদিকে অর্থনৈতিক ব্যয়সঙ্কোচ এবং অপরদিকে রাজনৈতিক দাসসৃষ্টি,—এই আত্যন্তিক গরজে বাধ্য হয়ে বৃটিশ কর্তৃপক্ষ সরকারীভাবে ইংরেজী শিক্ষার ব্যাপারে মনোযোগী হ'তে আরম্ভ করেন। ১৮৩৩ সালের নতুন সনদে জাতি, বর্ণ ও ধর্ম নির্বিশেষে দায়িত্বশীল পদে ভারতীয়দের নিয়োগ করার যে নীতি ঘোষিত হয়, তার পশ্চাতে পূর্বোক্ত অর্থনৈতিক চেতনা বর্তমান থাকা খুবই স্বাভাবিক।

যাই হোক, সনদের এই ধারাটি এদেশে ইংরেজী শিক্ষাবিস্তারে প্রত্যক্ষভাবে সহায়তা করে থাকবে। আর, মেকলে ১৮৩৫ সালে যে কথা ঘোষণা করেছিলেন, ইতিহাস বহু পূর্ব থেকেই অচেতনভাবে সে প্রয়োজন সাধন করে চলছিল। ১৮২৬ সালে ডিরোজিও শিক্ষকরূপে হিন্দু কলেজে প্রবেশ করেন। তাঁর স্বাধীনচিত্ততা, বুদ্ধিবাদী প্রজ্ঞা, যুক্তির প্রতি অবিচল নিষ্ঠা, যে কোন যুক্তিগ্রাহ্য মতবাদকে অঙ্গীকার করার মানসিক ঔদার্য, 'to live and die

for truth' আদর্শ, যুক্তির ধোপ-না-সহা বিশ্বাস দ্বারা পরিচালিত না হওয়ার প্রতিজ্ঞা,—বিদ্যুৎতরঙ্গে হিন্দু কলেজের ছাত্রদের মধ্যে বিস্তৃতি লাভ করে; এবং তাদের মাধ্যমে সমাজ-জীবনের বৃহত্তর পরিসরে প্রসারিত হ'তে উন্নত হয়।

আত্মিক, এমন কি ব্যবহারিক মুক্তিলাভের সুতীব্র পিপাসায় হিন্দু কলেজের ছাত্রগণ কেন আর্তনাদ করে উঠেছিলেন, সে সম্পর্কে দু'একটি কথা স্মরণযোগ্য। প্রাক্-বৃটিশ আমলের ভারতীয় সমাজ-কাঠামোতে ব্যক্তির নিজস্ব অন্য-নিরপেক্ষ স্বতন্ত্র কোন অস্তিত্ব স্বীকৃত ছিল না। সেই সমাজের একক অথবা ইউনিট এক একটি পরিবার। গ্রাম্য পঞ্চায়েৎ অথবা ক্ষেত্রবিশেষে গিল্ড, পঞ্চায়েৎ-ভুক্ত পরিবারের উপর যে সব সামাজিক দায়দায়িত্ব এবং কর্তব্য আরোপ করত, তা যথাযথ পালনই ছিল পরিবারের এবং পরিবারভুক্ত ব্যক্তিদের নির্বিঘ্ন সমাজীবন যাপন। ব্যক্তির স্বাধীন অস্তিত্ব অস্বীকৃত বলেই তার মানস-জীবন একান্তভাবেই পরিবার-নির্ভর ও পরিবারের শাসনাধীন, বিভিন্ন পরিবারের মানস-জীবন তেমনি গ্রাম্য পঞ্চায়েৎ অথবা গিল্ড-নির্ভর ও তাদের শাসনাধীন। তাদের শাসন-ক্ষেত্রের চৌহদ্দি খুব বিস্তৃত ছিল না, এবং বিস্তৃত ছিল না বলেই তার বিধান নির্মম, প্রতিবাদহীন, তার ন্যায়-অন্যায় বিচারের বিরুদ্ধে কোন আপীল নেই। ফলে, তার বাইরের আকৃতি গ্রাম্য হ'লেও, তার চক্ষু গ্রাম্য দেবতার মতো রক্তবর্ণ, দুর্বার ইচ্ছা-অনিচ্ছার প্রেরণায় স্বৈরাচারী। ইংরেজ-প্রবর্তিত শাসনব্যবস্থা, সামাজিক বিধিব্যবস্থা, ভূমি-সম্পর্ক, ইংরেজের ব্যক্তিগত সাহচর্য, ইংরেজী পঠনপাঠন ইত্যাদি পূর্বতন স্বৈরাচারী শাসনের ইমারত চূর্ণবিচূর্ণ করে দেয়। পরিবারগুলি পঞ্চায়েৎ-নির্ভরশীলতা থেকে মুক্তি লাভ করে। ভারতের সমাজ-ইতিহাসে এই প্রথম ব্যক্তি পরিবারের তথা গ্রাম্য পঞ্চায়েতের

তথা গিল্ডের শাসনবন্ধন মুক্ত হ'য়ে নিজস্ব প্রয়োজনে, স্বতন্ত্রভাবে চিন্তা করার অধিকার লাভ করলো। বাধা বন্ধনের কোন অবাঞ্ছনীয় অনুশাসনই আর তার রইলো না,—যে কোন ভাবরাশি ও কর্মে উদ্বুদ্ধ হওয়ার, যে কোন পন্থায় যে কোন বৃত্তি অবলম্বন করে যে কোন স্থানের অভিযাত্রী হওয়ার প্রতিবন্ধক আর তার নেই। সে মুক্ত, ইংরেজের মতোই মুক্ত, স্ব-তন্ত্র, স্বাধীন।

কোন সমাজব্যবস্থাই অবশ্য মানুষকে চুপি চুপি তার স্বরূপের কথা, নিজস্ব শক্তি ও বৈশিষ্ট্যের কথা শিখিয়ে দেয় না। চারিদিকের আবেগ-উৎফুল্ল হাওয়ায় সে বার্তা ছড়ানো থাকে। ইংরেজ সমস্ত অত্যাচার উৎপীড়ন, এবং দাসত্বের বন্ধন সত্ত্বেও ভারতবাসীর জন্য কোন্ মুক্তির বাণী বহন করে এনেছিল, ইংরেজী সাহিত্য-দর্শন-ইতিহাস-রাষ্ট্রনীতির মাধ্যমে হিন্দু কলেজের ছাত্রবৃন্দ তার আস্বাদ লাভ করেন, আর মুখ্যত লাভ করেন প্রিয়তম শিক্ষক ডিরোজিওর কণ্ঠস্বর থেকে। সেই অবিচল কণ্ঠ থেকে স্বাধীন চিন্তা ও সত্যনিষ্ঠার যে বজ্রনির্ঘোষ ধ্বনিত হয়েছিল তা-ই তাদের সংবেদনশীল চিত্তে মুক্তির প্রতিধ্বনি তোলে বলে দেয়, তারাও স্বাধীন, সত্যের জন্য তাদের জীবন অথবা মৃত্যু।

সমাজ-পরিবেশ আবেগ-উচ্ছ্বাস-কম্পিত, চঞ্চল। আর জাগরণের প্রথম উল্লাস যারা অনুভব করলেন আপন অন্তরে, তারা একটু অস্বাভাবিক মাত্রায় চঞ্চল, আপেক্ষিক বিচারে সম্ভবত উচ্ছৃঙ্খল। পূর্বতন ভারতীয় সমাজ ও সমাজসম্পর্কজাত সমস্ত আচার আচরণ থেকে নির্মোহ মুক্তি ঘোষণা করলেন তারা ; হাতে তাদের যুক্তি ও বুদ্ধিবাদের পতাকা। তাদের চোখ এমন এক ভবিষ্যতে নিবদ্ধ, যার অস্পষ্ট চিত্র রামমোহন-মানসে উদ্ভাসিত হয়েছিল। ইংরেজী সাহিত্য-দর্শন-ইতিহাস এবং অন্যান্য শাস্ত্রাদিতে তারা যে আদর্শ, বিচার-বুদ্ধি, নীতিধর্ম ও

যুক্তিবাদী মানসের সাক্ষাৎ লাভ করেছেন, প্রাচীন ভারতীয় চিন্তায় এবং সমকালীন বাংলা সমাজ-মানসে তার স্বীকৃতি ও পরিচয় ছিল না, থাকা স্বাভাবিকও নয়। বরং সমাজ-মানস নানা রকমেই ছিল কলুষদুষ্ট; অথচ সমাজ বিধায়কগণ শুধুমাত্র বয়স আর বিশ্বাসের অযৌক্তিক দাবীতে সেই কলুষের প্রতিই আনুগত্য দাবী করছিলেন। হিন্দু কলেজ বিদ্রোহ করলো; ইংরেজী শিক্ষা জীবনের প্রবাহপথে নিয়ে এসেছে যে সর্বগামী উদারচিত্ততা এবং বোধ ও বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা, তারই উপর নির্ভর করে ছাত্রদল বিশ্বাসকে বিচারের ক্ষেত্র থেকে চিরকালের জন্য বিসর্জন দিলেন, তুলে ধরলেন টম্ পেইনের 'Age of Reason.' (১)

এই যুক্তিবাদের সঙ্গে মিলিত হলো ব্যক্তিগত উচ্ছ্বাস—গতিহীন সমাজের জড়বন্ধন থেকে মুক্তিলাভের আনন্দ। সমাজজীবনে প্রচণ্ড এক বিস্ফোরণ দেখা দিল—সমগ্র কলকাতা কম্পিত হ'লো। 'Age of Reason' আশ্রয় করে তারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হ'লেন, হিন্দুর শাস্ত্রাদিতে যা নিষিদ্ধ, তা-ই আচরণীয়; যা বিধিসম্মত ও আচরণীয় তা নিশ্চয়ই অন্যায়, অসঙ্গত ও অনাচরণীয়। সুতরাং মুক্তির প্রথম ধাপ, হিন্দুর সামাজিক আচারবিরোধী কর্মকাণ্ডে আশ্রয়গ্রহণ। এই মুক্তির

---

(১) কলকাতার কোন পুস্তক ব্যবসায়ী Tom Paine-এর 'Age of Reason' বইখানার একশ' কপি বিলেত থেকে আনিয়েছিলেন, এবং এক টাকা মূল্যে বিক্রয়ের বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন। হিন্দু কলেজের কোন কোন ছাত্র এক কপির জন্য আট টাকা পর্যন্ত দিতে প্রস্তুত ছিলেন। শ্রীবিমান বিহারী মজুমদারের 'History of Political Thought' বই-এর ৮৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

প্রয়োজন তখন আত্যন্তিক; মন তখন স্পর্শ করতে চায় সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডকে। এই মুক্তি অর্জন না করলে ইংরেজ-আনীত ভাবসমুদ্রে অবগাহন এবং গতির তরঙ্গে তরঙ্গে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডময় পরিভ্রমণ অসম্ভব। সুতরাং হিন্দুর ধর্মকর্ম আচার-আচরণ বিসর্জিত হ'লো; সন্ধ্যা আহ্নিক ইত্যাদি তারা পালন করলেন হোমারের ইলিয়াড আবৃত্তি করে (২); নিষিদ্ধ আহারাদি ভক্ষণ করলেন, এবং উচ্ছিষ্টাংশ যেখানে সেখানে নিক্ষেপ করে নিষ্ঠাবান হিন্দুদের বিরক্ত করতে লাগলেন। ঐ ভাবমুক্তি অর্জনের প্রেরণা এতো বেশি ঐকান্তিক রূপে আত্মপ্রকাশ করেছিল যে, রাজনারায়ণ বসুর পিতা পুত্রকে তাঁর সঙ্গে একত্রে মদ্যপানে আহ্বান করতে সংকোচ বোধ করেননি! বিতর্ক সভায়, সাময়িক পত্রাদিতে এবং আলোচনা-বৈঠকে হিন্দুসমাজ ও ধর্মের উপর নির্মম আক্রমণ সুরু হলো। কী প্রচণ্ড ঘৃণায় আক্রমণকারীদের মন উদ্বেলিত হয়েছিল, হিন্দু কলেজের ছাত্র এবং পরবর্তীকালে হিন্দু ফ্রি স্কুলের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা মাধবচন্দ্র মল্লিকের এই উক্তিতে তা প্রতীয়মান হবে: "হিন্দুধর্ম্ম কুকর্ম্মের যদ্রূপ কারণ তদ্রূপ অপর কুকর্ম্মের জ্ঞান করি না হিন্দুধর্ম্মের দ্বারা যদ্রূপ কুক্রিয়ায় প্রবৃত্তি হয় এমত অপর কোন বিষয়ে আমরা বোধ করি না এবং সর্ব্বসাধারণ লোকের শান্তি ও কুশল ও সুখের হিন্দুধর্ম্মে যদ্রূপ ব্যাঘাত জন্মে তদ্রূপ অপর কোন বিষয়ে আমরা বুঝি না। এবং অযুক্তধর্ম্ম বিনাশার্থ আমাদের যে অভিপ্রায় তাহা কি ব্যঙ্গোক্তি কি তোষামোদ কি ভয় কি তাড়না কোন প্রকারেই আমরা ত্যাগ করিব না।'(৩)

---

(২) প্যারীচাঁদ মিত্রের উক্তি; শিবনাথ শাস্ত্রীর 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' গ্রন্থে উদ্ধৃত;

(৩) সংবাদপত্রে সেকালের কথা; ২য় খণ্ড ২য় সংস্করণ, পৃ ৫২

ঘরে ঘরে বিবাদ বিসম্বাদ, পীড়ন, নির্যাতন, বিচ্ছেদ। কেহ বিতাড়িত, কেহ নির্বাসিত। কিন্তু এহ বাহ্য, এহ তুচ্ছ। মুক্তির আস্বাদন-পাওয়া চিত্ত উদ্বেলিত, সে অকুতোভয়। কালের সৃষ্টিশীল প্রেরণাকে সে আত্মস্থ করেছে, হৃদয় তার সেই আনন্দে আত্মহারা; বিগতকালের ভ্রূকুটিকে স্পর্ধা করার মতো শক্তি সে আবিষ্কার করেছে তার নিজের দেহে ও মনে—ডিরোজিওর শিক্ষা সেই আবিষ্কারকে অবিনশ্বর আলোকে প্রদীপ্ত করে রেখেছে। সুতরাং যাত্রা নির্বিঘ্ন। রক্ষণশীল হিন্দুসমাজ সতীদাহের ব্যাপারে পরাজিত হয়েছে, কিন্তু হিন্দু কলেজের ছাত্রদের কিঞ্চিৎ শিক্ষাদানের শক্তি তার তখনও ছিল। ডিরোজিও অপসারিত হলেন অথবা পদত্যাগে বাধ্য হলেন; খৃষ্টান পাদ্রীদের বক্তৃতা শোনা ছাত্রদের পক্ষে নিষিদ্ধ হ'লো। ছাত্ররাও অপরিসীম ঘৃণায় হিন্দু সমাজের স্বৈরাচারী ব্যবস্থার উপর আক্রমণ সুরু করলেন—মহেশচন্দ্র ঘোষ, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় খৃষ্টধর্ম অবলম্বন করলেন। স্ত্রীশিক্ষার পক্ষে জোর তর্কবিতর্ক দেখা দিল। আরও কিছুকাল বাদে মধুসূদন গুপ্ত শবব্যবচ্ছেদ করলেন। প্রাচীন হিন্দুর সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ ধ্বসে যেতে লাগলো।

এমনিভাবে, এক অভূতপূর্ব সংঘাতে সুদীর্ঘকালের নিস্তব্ধ গতিহীন ভারতীয় সমাজের অন্তর-প্রদেশে ধীরে ধীরে গতির সঞ্চার হয়; অশ্রুতপূর্ব বাণী আর অদৃশ্যপূর্ব ঘটন-অঘটনের অভিঘাতে সামাজিক ভাবপরিমণ্ডল বিঘূর্ণীত হতে থাকে। এই নবীন গতিকে অবরুদ্ধ করার জন্য প্রাচীন-পন্থীদের কী নিদারুণ মর্মবেদনা; কী আকুল প্রচেষ্টা আর সমস্ত জীর্ণ আবেশকে সুকঠোর আঘাতে অতিক্রম করার জন্য ইংরেজী ভাবধারাপুষ্ট ব্যক্তিদেরও কী দুঃসাহস, কী লাঞ্ছনাভোগ; চরিত্রের কী দার্ঢ্য, কী বিস্ময়কর মানসিক প্রস্তুতি; আর তাদের কর্ম ও সাধনার পশ্চাতে

ইতিহাসের কেমন নির্বাক অথচ নিশ্চিত সমর্থন! সমাজ-পরিসরে এই যে বেদনা ও সংগ্রাম, তাতে প্রাচীনপন্থীদের পরাজয় অবশ্যম্ভাবী; কারণ, কালের অন্তরবেদনা ও প্রেরণার সঙ্গে তাদের কর্ম চিন্তা ও মননের কোন সংযোগ ছিল না। সৃষ্টির উদ্যম ও চৈতন্য তাদের কবল থেকে তাদের বিরুদ্ধবাদীদের পক্ষে চলে গিয়েছে। ইংরেজ ভারতের পূর্বমুখী দৃষ্টিকে পশ্চিমপানে ফিরিয়ে দিয়েছে, সৃষ্টির আলোক আর পূর্ব দিগন্ত থেকে আসে না, আসে পশ্চিম দিগন্ত থেকে। সহৃদয় হৃদয়সংবেদনায় যে পশ্চিমকে গ্রহণ করেছে, সে-ই নতুন কালের দ্রষ্টা ও স্রষ্টা। ডিরোজিওর পদত্যাগের পর হিন্দু কলেজের পরিচালকদের বৈঠকে অন্যান্য প্রসঙ্গের সঙ্গে ছাত্রদের মধ্যে নাস্তিকতার প্রসার সম্পর্কে আলোচনা হয়; বৈঠকে সেক্রেটারী উইলসন সাহেব সম্ভবত অসন্তুষ্ট হয়েই বলেন, 'বালকেরা যে সকল পুস্তকাদি কলেজে পাঠ করে তাহাতে কদাচ হিন্দুয়ানি মান্য করিবে না ইহাতে যাঁহার স্বেচ্ছা হয় কলেজে বালক পাঠাইবেন অনিচ্ছা হয় পাঠাইবেন না।'(৪) ডাঃ উইলসনের এই উক্তি কিঞ্চিৎ উদ্ধত হ'লেও কালের অন্তরপ্রেরণাসম্মত কথাই এতে প্রকাশিত হয়েছে।

এই সামাজিক সংঘাতের আবর্ত থেকে বিজয়ী এবং পরবর্তী কালের ভারতীয় সমাজজীবন ও সংস্কৃতির নির্মাতারূপে যাঁরা আবির্ভূত হ'লেন, নিজেদের বৈষয়িক ও সাংস্কৃতিক জীবনের অস্তিত্বের দরুন তাঁরা সর্বতোভাবেই বৃটিশ শাসনব্যবস্থা ও ইংরেজের করুণার উপর নির্ভরশীল হ'য়ে পড়েন। সুতরাং বৃটিশ সাম্রাজ্য-স্বার্থবোধের সঙ্গে তাঁদের মিত্রতা। দেশী ভূম্যধিকারী ও ব্যবসায়ীদের ক্ষেত্রে যেমন, এক্ষেত্রেও

(৪) সংবাদপত্রে সেকালের কথা; ২য় খণ্ড, পৃ ১৫

তেমনি, ইংরেজের অর্থনৈতিক ও সাম্রাজ্যিক স্বার্থই প্রকারান্তরে, তাঁদের সৃষ্টিকর্তা। জ্ঞাতসারে অথবা অজ্ঞাতসারেই হোক, জন্মের প্রথম প্রত্যূষ থেকে এ সম্পর্কে তাঁরা সচেতন ছিলেন। ইংরেজের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিজয় ধীরে ধীরে সাংস্কৃতিক বিজয়ে রূপান্তরিত হয়েছে। এই পরিবেশে ইংরেজের মুখনিসৃত বাণীই যুগবাণী। হিন্দু কলেজের ছাত্রদের মুখে মুখে তাই মেকলের উক্তি 'a single shelf of a good European Library was worth the whole native literature of India and Arabia' ধ্বনিত ও প্রতিধ্বনিত হ'তে থাকলো। 'তদবধি ইহাদের দল হইতে কালিদাস সরিয়া পড়িলেন, সেক্‌স্‌পিয়ার সে স্থানে প্রতিষ্ঠিত হইলেন ; মহাভারত, রামায়ণাদির নীতির উপদেশ অধঃকৃত হইয়া Edgeworth's Tales সেই স্থানে আসিল ; বাইবেলের সমক্ষে বেদবেদান্ত গীতা প্রভৃতি দাঁড়াইতে পারিল না।' (৫) বৃটিশ বিজয়ের যেটুকু অবশিষ্ট ছিল, ইংরেজী শিক্ষার মাধ্যমে তা পূর্ণ হ'লো। এই সময়ে অর্থাৎ বিদ্যাসাগরের ছাত্রজীবনকালে যাঁরা ছিলেন প্রাগ্রসর বাঙালীদের চিন্তানায়ক তাঁদের অনেকেই ছিলেন রাজা রামমোহনের কর্মীবন্ধু অথবা মন্ত্রশিষ্য। রামমোহন প্রদর্শিত পথে অগ্রসর হয়ে তাঁরাও ইংরেজ শাসনকে বিধাতার আশীর্বাদস্বরূপ গ্রহণ করেন। ইংরেজ শুধুমাত্র বর্তমান ও ভাবীকালের প্রভু নয়, সর্বকালের পরমাত্মীয় ; অনিন্দিতচরিত্র আদর্শ পুরুষ। ইংরেজ-উপাসনাই আত্মিক ও বৈষয়িক উন্নতির একমাত্র পন্থা। ঔপনিবেশিক শাসনব্যবস্থা তাঁদের সৃষ্টি করেছে, সুতরাং ন্যায়সঙ্গতরূপেই তাঁরা সৃষ্টিকর্তার নিকট দাবী করলেন রাজকার্যের দায়িত্বশীল অংশ। শুধু তাইবা কেন, বোধবুদ্ধি,

(৫) শিবনাথ শাস্ত্রী ; পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ ১১৫

ধ্যানধারণা, চলনবলন, পোষাক পরিচ্ছদ ইত্যাদিতে তাঁরা হ'তে চাইলেন খাঁটি ইংরেজ। [রক্ত ও বর্ণের অভিশাপ কাটাতে না পারলেও শুধু একবার ইংল্যাণ্ড দেখে আসার জন্য হৃদয়ের কী সুতীব্র আর্তি ছিল মধুসূদনের!] "দি পার্থেনন" পত্রে তাঁরা প্রকাশ্যে ঘোষণাও করেন, তাঁরা "Hindu by birth, yet European by education and its eoncomitants." ঐ চাওয়া ও ঘোষণার মধ্যে বৃটেনের সাম্রাজ্যিক স্বার্থ এবং ভারতের ধনতান্ত্রিক বিকাশধারার কাল-প্রেরণা অভিব্যক্ত ও সার্থক হয়ে থাকলেও, সেই বোধ যে বিকৃত এবং বিকাশধারা যে বিকলাঙ্গ তা বলাই বাহুল্য। অনেক ব্যর্থতার তিক্ত অশ্রুজলে পরবর্তীকালে তাঁদের অনুভব করতে হয় এই সত্য।

সে যাই হোক, এই ধারণার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি স্বরূপ তাঁরা ভারতে বৃটিশ শাসনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ—মেকলের প্রত্যাশামত শাসক ও শোষিতের মধ্যে সেতুবন্ধ—হ'য়ে পড়লেন এবং হ'তে চাইলেন। এদেশে এবং এদেশবাসীর প্রতি তাঁদের হৃদয়ের কোন আকর্ষণই রইলো না, যে ইংরেজ তাঁদের বিশ্বসাহিত্যের রত্নসম্ভার উপহার দিয়েছে, দিয়েছে বুদ্ধিবাদী মনন ও যুক্তিবাদী দর্শন, যে ইংরেজ তাঁদের ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্যকে উদ্বুদ্ধ করেছে, হৃদয় তাকে কেন্দ্র করেই বিবর্তিত হয়, তারই সুশাসনের ছত্রছায়ায় বৈষয়িক সমৃদ্ধি চায়। তাই, হিন্দু-কলেজের ছাত্রবৃন্দ সুকঠিন দার্শনিক তত্ত্বাদি সম্পর্কে তর্কবিতর্ক এবং সুগভীর মনোধর্মিতার পরিচয় দিলেও ব্যবহারিক কর্মক্ষেত্রে তাঁরাও ইতিহাসের অমোঘ অনুশাসনে ভারতে বৃটিশ শাসনের সহায়ক ও সাম্রাজ্যের শুভাকাঙ্ক্ষী হ'য়ে পড়লেন; কালের অন্তরপ্রেরণা এমনি-ভাবে তাঁদের কর্মে চিন্তায় মননে অভিব্যক্ত হয়। তাঁদের রাজনীতি সাম্রাজ্যবাদী শাসকের রাজনীতি। দ্বারকানাথ ঠাকুরের একটি উক্তি

দ্বারা এই নবীন বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর রাজনৈতিক আচরণের পরিচয় দেওয়া যেতে পারে : 'I have worked in my humble sphere under a firm conviction that the happiness of India is best secured by her connection with your own great and glorious country, and that the more sensible they would become of the invincible power of the protecting state, of the excellence of a government, whose noble solicitude for the welfare and improvement of millions committed by Providence to its charge may challenge the admiratian of the wide world.' (৬) বলাবাহুল্য, ইংরেজের প্রতি মমত্ববোধ ও শ্রদ্ধা বৃটিশ শাসনের অপর পৃষ্ঠা—যেখানে সীমাহীন দুঃখদারিদ্র্য উৎপীড়ন অত্যাচার, ভারতীয় শিল্পবাণিজ্যের বিনাশ এবং পরাধীনতা লুক্কায়িত—থেকে তাঁদের দৃষ্টিকে সযত্নে রক্ষা করে এসেছে।

হিন্দু কলেজের ঐ সময়কার ছাত্রবৃন্দ হিন্দুসমাজকে নানাভাবে উৎপীড়িত করলেও এবং কোন কোন ক্ষেত্রে তাঁদের ব্যক্তিগত চরিত্রে কলুষ থাকলেও, সমবেতভাবে তাঁরা যে শ্রেয়বোধ, সত্য ও আদর্শের প্রতি যে নিষ্ঠা, এবং চিন্তারাজ্যে যে অভাবনীয় বলিষ্ঠতা ও দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন, তা বিস্ময়কর। তাঁদের অবিচল সত্যনিষ্ঠ আচরণের

---

(৬) ১৮৪৩ সালের 'The Friend of India' পত্র থেকে শ্রীবিমান বিহারী মজুমদার কর্তৃক তাঁর পূর্বোক্ত গ্রন্থে উদ্ধৃত। মুখ্যতঃ তাঁদেরই উদ্যোগে ১৮৪৩ সালে যে বৃটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি স্থাপিত হয়, তার ঘোষণায় বলা হয়, রাণী ভিক্টোরিয়ার প্রতি শ্রদ্ধা ও আনুগত্য জ্ঞাপন করে সোসাইটির কাজ পরিচালিত হবে।

ফলেই সেকালে 'কলেজবয়' কথাটি সত্যের প্রতিশব্দ রূপে ব্যবহৃত হ'তো। (৭) ইংরেজের সামাজিক ও ন্যায়শাস্ত্রাদিতে তাঁরা যে সত্য ও ন্যায়বিচারের সাক্ষাৎ লাভ করেন, তাঁদের ঐকান্তিক কামনা ছিল তাকে ভারতের সমাজজীবনে প্রতিষ্ঠিত করার। ভারতের বিকাশধারা ইংল্যাণ্ডের বুর্জোয়া বিকাশধারার অনুরূপ হোক, তাই তাঁদের ইচ্ছা। সত্য ও সত্যনিষ্ঠা তাঁদের জীবনসূর্য। রসিককৃষ্ণ মল্লিক, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি যখন 'জ্ঞানান্বেষণ' পত্র প্রকাশ করেন, তখন আদর্শ হিসাবে তাতে তাঁরা লেখেন—

এহি জ্ঞান মনুষ্যানামজ্ঞানতিমির হর
দয়া সত্যঞ্চ সংস্থাপ্য শঠতামপি সংহর ॥
[বাঞ্ছা হয় জ্ঞান তুমি কর আগমন।
দয়া সত্য উভয়কে করিয়া স্থাপন ॥
লোকের অজ্ঞানরূপ হর অন্ধকার।
একেবারে শঠতার করহ সংহার ॥]

অজ্ঞানতা দূর করবার জন্য, এবং বিশেষত 'যে অযুক্ত (হিন্দু) ধর্ম্মের শৃংখলে বহুকালাবধি আমারদের মন বদ্ধ আছে' তার অজ্ঞানতা থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য তাঁরা স্কুল প্রতিষ্ঠা করছেন, স্ত্রীশিক্ষার জন্য কোলাহল

---

(৭) Indeed the college boy was a synonym for truth and it was a general belief and saying amongst our countrymen, which those that remember the time, must acknowledge, that "such a boy is incapable of falsehood because he is a college boy."—Biography of Henry Derozio by Thomas Edwards.

করছেন। এই সত্য ও শ্রেয়বোধ ইতিহাসসৃষ্টির মূলে। ধীরে ধীরে তা সমাজের বৃহত্তর ক্ষেত্রে প্রসারিত হচ্ছিল; হিন্দুকলেজের সহিত সম্পূর্ণ সম্পর্কহীন জনৈক ব্রাহ্মণ চুচুঁড়া থেকে 'সমাচার দর্পণ' সম্পাদককে লিখছেন, 'যদ্যাপি পুরুষদের সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রীদিগকে বিদ্যা শিক্ষা না দেওয়া যায় তবে দেশের সৌষ্ঠব হওনের অতি বিলম্ব হইবে। সকল দেশেই সর্ব্বকালেই পুরুষেরা স্ত্রীলোকের বাধ্য বটেন এবং ইহা যথার্থ বটে স্ত্রীলোকেরা যদি সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞানাবস্থায় থাকেন তবে পুরুষেরা কিরূপে সর্ব্বতোভাবে সভ্যতাপ্রাপ্ত হইতে পারেন।' (৮) যদিও হিন্দুকলেজের ছাত্রদের সম্মুখে ইংরেজ তখন আদর্শ পুরুষ, বৃটিশ শাসন বিধাতার আশীর্বাদ, এবং তাদের ভাব ও মানসজীবন যদিও বহুলাংশে ইংরেজকে কেন্দ্র করেই বিবর্তিত হচ্ছিল তথাপি তাঁদের কর্মক্ষেত্র ছিল দেশীয় সমাজ; এবং স্বল্পকালের মধ্যেই ঐ কর্মের প্রভাব দেশীয় সমাজে অনুভূত হতে লাগলো। ইংরেজ অথবা ইংরেজের মত হওয়ার অসম্ভব কল্পনায় প্রমত্ত হ'লেও, জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে, প্রাগ্রসর চিন্তা, স্বাধীন মুক্ত ভাবধারার প্রচার ও দুঃসাহসিক কর্মের সাহায্যে তাঁরা ভারতীয় সমাজকে রূপান্তরিত করে চলছিলেন। তাঁদের আক্রমণই এই সমাজকে গতিশীল করে। সংস্কৃতি তথা জীবন, রূপান্তরের পথে।

॥ ২ ॥

ইহাই বিদ্যাসাগরের ছাত্রজীবনকালীন সামাজিক আবর্তের সংক্ষিপ্ত পরিচয়। এই আবর্তের নায়ক হিন্দু কলেজের ছাত্রবৃন্দ। বিদ্যাসাগর পড়তেন সংস্কৃত কলেজে। কিন্তু সে আমলে হিন্দুকলেজ এবং সংস্কৃত কলেজ একই ভবনে অবস্থিত ছিল। তাঁরই মত আপাতনিরীহ কৃকাকায়

(৮) সংবাদপত্রে সেকালের কথা; ২য় খণ্ড, পৃ ৯৯

ছেলের দল কলেজের ভিতরে ও বাইরে যে প্রলঙ্কর আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল, যাঁরা কলকাতার সমস্ত বাগবিতণ্ডার কেন্দ্রস্থল, কলেজে যাতায়াতের পথে প্রতিদিন তিনি যাঁদের দেখছেন, যাদের বুদ্ধিদীপ্ত কথাবার্তা শুনছেন, তাঁদের সম্পর্কে তাঁর অথবা সাধারণভাবে সংস্কৃত কলেজের অন্যান্য ছাত্রদের মনোভাব কি ছিল, তাঁদের বিতর্কসভায় তাঁর যাতায়াত ছিল কিনা, তাঁদের পত্রপত্রিকা পাঠের সুযোগ তাঁর হয়েছিল কিনা, অথবা কোন্ কোন্ সাময়িক পত্র তিনি পাঠ করতেন, কার চিন্তা ও আদর্শ তাঁর মনকে স্পর্শ করেছিল অথবা আদৌ করেছিল কিনা, ইত্যাদি বিষয় নির্ধারণ করা সুকঠিন। এই সামাজিক আলোড়নে সংস্কৃত কলেজের ছাত্রদের মানসপট বিচলিত হয়েছিল কতদূর, অথবা আদৌ হয়েছিল কিনা, তাও নির্ণয়ের কোন উপায় নেই। বিদ্যাসাগরকে আমরা সে সময়ে একনিষ্ঠচিত্তে অধ্যয়নে রত দেখতে পাই। কল্পনাতীত আর্থিক দুর্দশার মধ্যে থেকেও সুকঠোর অধ্যবসায়ে তিনি ইতিমধ্যেই সংস্কৃত কলেজের সর্বাগ্রগণ্য ছাত্ররূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন; তাঁর পাণ্ডিত্যে অধ্যাপকশ্রেণী বিস্ময়ে হতবাক্। এছাড়া তাঁর মানসজীবন সম্পর্কে আর কোন তথ্য পাওয়া যায় না। শুধু একটুখানি কৌতূহলোদ্দীপক সংবাদ পাওয়া যায় যে, তিনি নাকি এসময়ে সন্ধ্যাদিনিত্যকর্ম বিস্মৃত হয়েছিলেন; অবশ্য এই বিস্মৃতির পশ্চাতে সমসাময়িক সমাজ-বিক্ষোভের অবদান কতোটা তা সম্পূর্ণ অনিশ্চিত। তাছাড়া রামগোপাল ঘোষ, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, রামতনু লাহিড়ী প্রভৃতির সঙ্গে সে সময়ে পরিচিত হলেও সে পরিচয় ভাববিনিময়ের পর্যায়ে পৌঁছায়নি। সংস্কৃত কলেজে থাকাকালীন অল্পকালের জন্য ইংরেজী অধ্যয়নের সুযোগ পেয়ে থাকলেও বিদ্যাসাগরের জীবনে পাঠান্তে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে চাকুরি গ্রহণের পূর্বে সাক্ষাৎ ইংরেজ-সংস্পর্শও ঘটেনি।

পিতৃ-শাসনে তাঁর জীবন নিয়ন্ত্রিত ; নিয়মের ব্যতিক্রম হওয়ার উপায় ছিল না, আর পরিশ্রমের অন্ত ছিল না। পিতৃশাসন তাঁকে প্রমত্ত হতে দেয়নি ; পরিশ্রমের ভারে তাঁর মনের অপরিমিত তৃষ্ণা চাপা পড়ে গিয়েছিল। কিন্তু, এই প্রশান্তির অন্তরালে ইতিহাস অতি সংগোপনে কাজ করে চলছিল।

কালের অন্তর-প্রেরণা কী বিচিত্র পথে যাতায়াত করে, কী জটিল পথে নিজেকে উপলব্ধি করে, বিদ্যাসাগর-চরিত্র তার প্রকৃষ্ট নিদর্শন। বার বৎসরের সংস্কৃত পঠন-পাঠন ব্যর্থ হয়ে গেল,—হিন্দু ধর্মকর্ম শাস্ত্রাদি ও দার্শনিক চিন্তাধারা তাঁর মানসপটে অধিকার বিস্তার করতে পারলো না। ইংরেজের সামাজিক ন্যায়শাস্ত্রাদির মর্মবাণী ও কুসংস্কারজয়ী মনন তাঁর চিত্ত স্পর্শ করেছে। কালের যে অন্তর-প্রেরণা হিন্দু কলেজের ছাত্রদের ধ্যানধারণা চিন্তা ও কর্মের মাধ্যমে অভিব্যক্তি লাভ করছিল, কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হওয়ার পর দেখা গেল, সংস্কৃত কলেজের ছাত্র বিদ্যাসাগরের কর্মের ভিতর দিয়েও সেই অন্তর-প্রেরণাই অধিকতর তীব্র সামাজিক গুরুত্ব ও তাৎপর্য নিয়ে প্রকাশিত হচ্ছে। যখন তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ নীরব ও প্রশান্ত, তখনই সম্ভবত, তাঁর চিত্ত বাঙময় হয়ে উঠেছিল।

এই একটিমাত্র ক্ষেত্রেই হিন্দু কলেজ সংস্কৃত কলেজের নিকট পরাজিত হ'লো। অবশ্য এই পরাজয়ে গ্লানি নেই।

॥ ৩ ॥

সংস্কৃত কলেজে যা সম্ভব হয় নি, কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করে বিদ্যাসাগর তা সম্পন্ন করলেন—ইংরাজীতে কৃতবিদ্য হ'লেন। এই সময়েই তিনি ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সম্পাদক ক্যাপ্টেন মার্শাল এবং কাউন্সিল অব এডুকেশনের সম্পাদক ডাঃ মোয়াটের ঘনিষ্ঠ সাহচর্যে আসেন, এবং তাঁরা

যেমন বিদ্যাসাগরের কর্মনৈপুণ্যে শ্রদ্ধাবান হন, তাঁর আনুকূল্য করে তাঁরা তাঁর মানসজীবনকেও কিঞ্চিৎ প্রভাবিত করে থাকবেন। তাঁদেরই সহায়তায় তিনি প্রথমে সংস্কৃত কলেজের সহকারী সম্পাদকের পদে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর ব্যবস্থাপনায় কলেজের সম্পাদক রসময় দত্ত নানাভাবে অসহযোগিতা করতে থাকায় বিরক্ত হয়ে তিনি পদত্যাগ করেন ; পরে আবার তাদেরই পৃষ্ঠপোষকতায় ১৮৫৩ সালের জানুয়ারীতে তিনি কলেজের অধ্যক্ষ নির্বাচিত হন,—সম্পাদক ও সহসম্পাদকের পদদ্বয় বিলুপ্ত হয়। সংস্কৃত কলেজের পুনর্গঠন ব্যাপারেই তাঁর অসামান্য ও প্রখর কাল-চেতনার এবং সমাজবিপ্লবী মননের পরিচয় পাওয়া যায়।

পূর্ব সংস্কার অনুযায়ী সে আমলে সংস্কৃত কলেজ প্রতিপদ ও অষ্টমী তিথিতে বন্ধ থাকত ; বিদ্যাসাগর তা রদ করে অন্যান্য ইংরেজী বিদ্যালয়ের ন্যায় রবিবার বন্ধ থাকার প্রথা চালু করলেন। তখন পর্যন্তও শুধুমাত্র ব্রাহ্মণ ও বৈদ্য ছাত্ররাই সংস্কৃত কলেজে অধ্যয়নের সুযোগ পেত ; বিদ্যাসাগর অধ্যক্ষ হওয়ার ছ'মাস যেতে না যেতেই কায়স্থদের প্রবেশাধিকার দিলেন, আর বছর যেতে না যেতে অন্যান্য ব্রাহ্মণেতর জাতির ছাত্রদের জন্য সংস্কৃত কলেজের দ্বার উন্মুক্ত করে দিলেন। হিন্দুধর্ম লোপের আশঙ্কায় সম্মানিত অধ্যাপকরা তাঁর কর্মের বিরোধিতা করার চেষ্টা করলেন। বিদ্যাসাগর অকাট্য যুক্তির সাহায্যে সনাতনপন্থী ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের আদর্শ ও ব্যবহারে, নীতি ও কর্মে স্ববিরোধ (৯) প্রতিপন্ন করে তাঁদের নিরস্ত করেন। সংস্কৃত কলেজের তৎকালীন

(৯) তিনি বলেছিলেন, শূদ্ররা যদি সংস্কৃত চর্চায় অনধিকারী, তাহলে তাঁরা রাজা রাধাকান্ত দেবের সংস্কৃত চর্চা বন্ধ করছেন না কেন ? অর্থের প্রলোভনে ম্লেচ্ছ সাহেবদেরই বা সংস্কৃত পড়ান কেন ?

অধ্যাপকবৃন্দের সময়-চেতনা বলে কোন বস্তু ছিল না ; তাঁরা ছিলেন কালের উর্ধ্বে—যখন খুসী কলেজে আসতেন, যখন খুসী চলে যেতেন। বিদ্যাসাগর কালধর্ম অনুযায়ী তাঁদের সময়-সচেতন হ'তে বাধ্য করলেন। সংস্কৃত শিক্ষাকে সহজ সুগম করার জন্য স্বয়ং ব্যাকরণ রচনা করলেন, এবং ১৮৫৩ সালে সুবিস্তৃত পরিকল্পনায় সংস্কৃত কলেজে ইংরেজী শাস্ত্রাদির পঠনপাঠন প্রবর্তন করেন।

এমনিভাবে, কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গেই বিদ্যাসাগর শিক্ষা ও মনোজীবনের ক্ষেত্রে সুদূরপ্রসারী রূপান্তর সাধনে অগ্রণী হলেন। সংস্কৃত কলেজ পুনর্গঠনের পশ্চাতে কোন্ আদর্শের অনুপ্রাণনা ছিল তার কিঞ্চিৎ আলোচনা করলেই বিদ্যাসাগর-মানসের বোধ ও উপলব্ধির সাক্ষাৎ পরিচয় পাওয়া যাবে। কাশীর সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ডাঃ ব্যালেন্টাইন কলকাতার কলেজ সম্পর্কে একটি রিপোর্ট পেশ করেছিলেন বাংলার কর্তৃপক্ষের নিকট। সেই রিপোর্ট সম্পর্কে বিদ্যাসাগরের মতামত চাওয়া হলে তিনি কাউন্সিল অব এডুকেশনকে লিখিত পত্রে বলেন, এমন এক শ্রেণীর লোক সৃষ্টি করাই তাঁর জীবনের ব্রত সমস্ত শাস্ত্রাদিতে যারা হবে সুপণ্ডিত, অথচ এ-দেশের কুসংস্কার যাদের কোনভাবেই স্পর্শ করবে না। তাঁর নিয়ন্ত্রণাধীন সংস্কৃত কলেজের সমস্ত উদ্যম ঐ উদ্দেশ্যেই ব্যয়িত হ'বে। স্বল্পকালের অভিজ্ঞতায় তিনি লক্ষ্য করেছেন, এই সংস্কৃত কলেজ থেকেই ঐরূপ ছাত্র গড়ে উঠবে, যারা সর্ববিদ্যায় পারদর্শী অথচ কুসংস্কারমুক্ত। এই সংস্কারমুক্ত ছাত্ররাই একদা গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে পড়বে এবং তাদের দেশবাসীদের মধ্যে জ্ঞানের আলোক বিস্তার করবে। এবং প্রকারান্তরে তারাই হ'বে নতুন দেশ ও নতুন জীবনের সৃষ্টিকর্তা।

১কালীন শিক্ষাব্যবস্থা, সংস্কৃতাভিমানী পণ্ডিতবর্গ, পরিবর্তিত

সমাজব্যবস্থায় সংস্কৃত পঠনপাঠনের উপযোগীতা, ইত্যাদি সমস্যা সম্পর্কে তাঁর মনোভাব কি তাও তিনি অত্যন্ত খোলাখুলিভাবেই আলোচনা করেন। এই পত্রে তিনি স্পষ্টাক্ষরে ঘোষণা করেন, 'For certain reasons, which it is needless to state here, we are obliged to continue the teaching of the Vedanta and Sankhya in the Sanskrit College. That the Vedanta and Sankhya are false systems of philosophy is no more a matter of dispute ....Whilst teaching these in the Sanskrit course we should oppose them by sound philosophy in the English course to counteract their influence,' নানা কারণে সংস্কৃত কলেজে বেদান্ত ও সাংখ্য পড়াতে বাধ্য হলেও ইংরেজীতে তিনি এমন সব গ্রন্থের সঙ্গে ছাত্রদের পরিচিত করাতে চান, যাদের আদর্শ ও যুক্তিধারা বেদান্ত ও সাংখ্যের প্রভাব থেকে শিক্ষার্থীদের মানসপরিমণ্ডল মুক্ত করতে পারে। এই একই কারণে তিনি বিশপ বার্কলির গ্রন্থাদি পাঠ্য-পুস্তকরূপে অনুমোদন ও গ্রহণ করতে পারেননি। কারণ, বার্কলির সিদ্ধান্তও বেদান্ত ও সাংখ্যের মত ভ্রান্ত। ফলে, বার্কলি পাঠ করে বেদান্ত ও সাংখ্যের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হওয়ার পরিবর্তে ছাত্ররা বরং অধিকতর আকৃষ্টই হবে, এবং শিক্ষার্থীদের মনকে পরিশুদ্ধ, বুদ্ধিবাদী, সত্যনিষ্ঠ এবং দেশীয় কুসংস্কার-মুক্ত করার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হবে। এই পরিস্থিতিতে তিনি সেজন্যেই জন ষ্টুয়ার্ট মিলের গ্রন্থাদির অধ্যয়ন অপরিহার্য ('indis pensable') বলে ঘোষণা করছেন। এই সময়ে ডাঃ মোয়াটের নিকট লিখিত আরও একটি পত্রে [৫-১০-১৮৫৩] তিনি এই ভঙ্গীতে লেখেন, 'বাংলায় প্রকৃত অধিকার জন্মানোর জন্য যদি সংস্কৃত পঠনপাঠনের ব্যবস্থা করতে পারি, এবং তারপর যদি ইংরেজীর সাহায্যে ছাত্রদের মনে বিশুদ্ধ জ্ঞানসঞ্চার

করতে পারি...” ইত্যাদি। স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়, মেকলের যে উক্তি হিন্দু কলেজের ছাত্রদের মুখে মুখে ধ্বনিত হ'তো তার অনুচ্চারিত প্রতিধ্বনি বিদ্যাসাগর-মানসেও অনুভূত হয়েছিল ; তিনিও ইংরেজের মানস-সন্তান হিন্দু কলেজের ছাত্রদের মত ইংরেজী শাস্ত্রাদিকে বিশুদ্ধ সত্যের আধার এবং ইংরেজী শিক্ষা ও ঐ শাস্ত্রাদির অধ্যয়ন-অধ্যাপনাকে জ্ঞান ও সত্যোপলব্ধির উপায় বলে মনে করতেন। যা সত্য তাই ধ্যেয় ; বিদ্যাসাগর সেজন্যই ইংরেজী চর্চা দ্বারা শিক্ষার্থীদের মানস-পরিমণ্ডল পরিশুদ্ধ করতে চেয়েছেন। আরও লক্ষ্য করার বিষয়, সাংখ্য ও বেদান্ত বাতিল করার মধ্যে একটু সংকোচ, একটু দ্বিধা নেই।

তাঁর সমাজ-সচেতন রূপান্তরধর্মী সংবেদনশীল চিত্ত, তাঁর দেশবাসীর, বিশেষত পাণ্ডিত্যাভিমানী ব্যক্তিদের, কুসংস্কার ও গোঁড়ামিতে বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিল ; এই বিক্ষোভ তিনি কোনক্রমেই দমন করতে পারছিলেন না। ডাঃ ব্যালেণ্টাইনের রিপোর্টের উত্তরে লিখিত পত্রে তিনি ঘোষণা করেন, 'The bigotry of the learned in India, I am ashamed to state, is not in the least inferior to that of the Arab.' 'এই পাণ্ডিত্যাভিমানী ব্যক্তিদের চিন্তাধারার রূপান্তর কোনমতেই সম্ভব নয় বলে তাঁর নিশ্চিত বিশ্বাস হয়েছিল ; তাই সংস্কৃত কলেজের পরিবর্তিত ব্যবস্থাপনায় তিনি তাঁদের সাহচর্য বা আনুকূল্য কামনা করেন নি, বরং অত্যন্ত তেজোদৃপ্ত ভাষায় ঘোষণা করেছিলেন, তাঁদের কোনরকমের সাহায্যই তিনি প্রার্থনা করেন না। যাঁদের প্রভাব ক্রমেই ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে আসছে, তাঁদের ভয় করলে তাঁর চলে না। কতোখানি শক্তি, দৃঢ়তা, সঙ্কল্প ও দুঃসাহসের অধিকারী একজন মানুষের পক্ষে সমগ্র পণ্ডিতসমাজকে উপেক্ষা করে একথা বলা সম্ভব, তা শুধু কল্পনা করাই চলে, ব্যাখ্যা করা

যায় না। অথচ বিদ্যাসাগর বার বৎসর সংস্কৃত শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করেছিলেন। এই শিক্ষাকে উপেক্ষা করে তাঁর কাল-সচেতন মন, বোধ ও বুদ্ধি তাঁকে সম্পূর্ণ বিপরীত সিদ্ধান্তে পৌঁছে দিয়েছে; তিনিও পূর্বমুখী বাংলা সমাজকে পশ্চিমমুখী করার জন্য বদ্ধপরিকর। পশ্চিমের গতিবিক্ষুব্ধ ভাবরাশি তাঁর চিত্তেও বিদ্রোহের ও সৃষ্টির উন্মাদনা জাগিয়েছে; তিনি অশান্ত, অস্থির। বিশেষ স্মরণযোগ্য যে, বিদ্যাসাগর ঐসব কথা ঘোষণা করছিলেন তখন, যখন কলকাতার রক্ষণশীল হিন্দু ও ব্রাহ্মরা হীরাবুলবুলের পুত্রকে কেন্দ্র করে অত্যন্ত বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিলেন, এবং হিন্দু ধর্ম ও সমাজের পবিত্রতা রক্ষার জন্য হিন্দু মেট্রোপলিটান কলেজ স্থাপন করেছিলেন। (১০) রক্ষণশীল হিন্দু সমাজ ও বিদ্যাসাগরের পারস্পরিক কর্মের তুলনামূলক বিচার করলেই বিদ্যাসাগরের আদর্শের সামাজিক গুরুত্ব উপলব্ধি করা যাবে। দেখা যাবে, রক্ষণশীল হিন্দুসমাজের পশ্চাতে ইতিহাসের কোন সমর্থন নেই, কিন্তু বিদ্যাসাগরে তা পূর্ণমাত্রায়।

---

[১০] ১৮৫৩ সালে কলকাতার হীরাবুলবুল নাম্নী এক পশ্চিমা গণিকার পুত্রকে হিন্দু কলেজে ভর্তি করা হয়। তাতে বেশ একটা সোরগোল পড়ে যায়। কলেজের পরিচালক সমিতির অধিকাংশ হিন্দু সদস্য এই ভর্তি-ব্যাপারে আপত্তি তোলেন। কিন্তু, সরকারী শিক্ষা কমিটি এই প্রতিবাদে কোনরূপ কর্ণপাত করলেন না। তখন রক্ষণশীল সমাজের নেতৃস্থানীয় বিধায়কগণ সংঘবদ্ধ হয়ে হিন্দু মেট্রোপলিটান কলেজ স্থাপন করেন। দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুর প্রভৃতিরও এতে সহায়তা ছিল। বলা বাহুল্য কয়েক বৎসর পর এই কলেজ উঠে যায়।

অত্যন্ত দূরপ্রসারী দৃষ্টি ও ব্যাপক জীবনবোধের সাহায্যে বিদ্যাসাগর অনুভব করেছিলেন, এই হতভাগ্য দেশকে যদি তার বর্তমান অধঃপতন থেকে উদ্ধার করতে হয়, তাহলে এদেশের অচল অনড় সমাজকে পশ্চিমের গতি দ্বারা সঞ্চালিত করতে হবে। ইংরেজের ধ্যানধারণা, সামাজিক শ্রেয়বোধ, ন্যায়াদর্শ এবং সর্বোপরি ইংরেজী শিক্ষাই এই কর্মের প্রধান হাতিয়ার। তাঁর কামনা ছিল, পশ্চিমের দেহাত্মবুদ্ধি ভারতীয় অধ্যাত্মবাদের আবিলতা দূর করুক। কিন্তু, ইংরেজী শিক্ষার তৎকালীন পরিস্থিতিতে ইহাকে সুদূরতম পল্লীর দরিদ্র চাষীর দ্বারদেশে পৌঁছে দেওয়া অসম্ভব ; এবং অসম্ভব বলেই বাংলা ভাষার সাহায্যে ঐ ভাবধারাকে অর্থাৎ পশ্চিমী গতিকে বাংলার সমাজ-জীবনে প্রসারিত করার আকাঙ্ক্ষা ছিল তাঁর। এই উদ্দেশ্যে প্রথম থেকেই তিনি বাংলা স্কুল স্থাপনের জন্য বিশেষ আগ্রহশীল ছিলেন, এবং হার্ডিঞ্জ যে শতাধিক পরীক্ষামূলক বাংলা পাঠশালা স্থাপন করেছিলেন, তার সঙ্গে বিদ্যাসাগরের ঘনিষ্ঠ সংযোগ ছিল। পরবর্তীকালে বাংলার প্রথম লেঃ-গভর্ণর ফ্রেডারিক হ্যালিডের আমলে বিলাতী কর্তৃপক্ষ এবং গভর্ণর-জেনারেলের অনুমোদনক্রমে বাংলাদেশে যেসব মডেল স্কুল স্থাপিত হয়, তার মূলে ছিল বিদ্যাসাগরেরই সুনিপুণ পরিকল্পনা। শিক্ষাসংক্রান্ত প্রায় সমস্ত ব্যাপারেই হ্যালিডে বিদ্যাসাগরের বিচারবুদ্ধি ও সুবিবেচনার উপর নির্ভর করতেন। তাঁর ধ্যান আদর্শ ও পরিকল্পনার সঙ্গে সরকারী উদ্যম, অর্থ ও পৃষ্ঠপোষকতা সংযুক্ত হওয়ায় বিদ্যাসাগর অসামান্য শ্রমসহিষ্ণুতা, মনোবল ও সাফল্যলাভের দুর্বার গতিবেগ নিয়ে কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হলেন। কোন ক্লান্তি নেই, কোন অবসাদ নেই, ব্যক্তিগত প্রয়োজনের কোন আকর্ষণ নেই, বিশ্রামের কোন তাগিদ নেই, বিদ্যাসাগর ১৮৫৫ সালের

আগষ্ট থেকে ১৮৫৬ সালের ১৪ই জানুয়ারীর মধ্যেই নদীয়া, হুগলী, বর্ধমান ও মেদিনীপুর জেলায় প্রতি জেলায় পাঁচটি করে মোট কুড়িটি মডেল স্কুল স্থাপন করেন। এবং মডেল স্কুলের উপযুক্ত শিক্ষক তৈরীর জন্য হিন্দু কলেজের বাংলা স্কুল 'পাঠশালাকে' সংস্কৃত কলেজের অন্তর্গত নর্মাল স্কুলে পরিণত করেন। এই সব কর্মের মধ্যে যে বিদ্যাসাগরকে আমরা পাই, তিনি পরাজয় জানতেন না; তিনি কর্মশক্তিতে দুর্বার, সংকল্পে অটুট। তাঁর সিদ্ধান্ত যেমন দ্রুত, দৃষ্টিশক্তি তেমনি নির্ভুল। মানুষের পছন্দ-অপছন্দ, আলোচনা-সমালোচনার প্রতি যেমন ভ্রূক্ষেপহীন, তেমনি অপ্রতিরোধ্য।

এই বিদ্যাসাগরই স্ত্রীশিক্ষার নায়ক। ইংরেজ-আগমনে ভারতের বুর্জোয়া বিকাশধারা অত্যন্ত সঙ্গতরূপেই নারীমুক্তি আন্দোলনকে অন্যতম সামাজিক সমস্যারূপে প্রত্যক্ষ জীবনের ক্ষেত্রে টেনে নিয়ে এসেছে। সে-কালের মানুষ এই সমস্যার চ্যালেঞ্জ গ্রহণও করেছিল, কিন্তু নানাবিধ সংকোচ ও অসম্পূর্ণতায় তাদের প্রচেষ্টা ছিল পঙ্গু ও ক্ষীণায়ু। ধর্মপ্রচারের অসাধু উদ্দেশ্য খ্রীষ্টান পাদ্রীদের এবং সনাতন মনোভঙ্গী রাধাকান্ত দেবের স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের প্রচেষ্টাকে বিকলাঙ্গ করে রেখেছিল। হিন্দু কলেজে স্ত্রীশিক্ষার কলরব ছিল বেশী, কর্ম তেমনি কম। প্রাক্-বিদ্যাসাগর যুগ এমনি দ্বিধাজড়িতভাবে অতিবাহিত হওয়ার পর বেথুন সাহেব অগ্রণী হয়ে ১৮৪৯ সালে কলকাতায় একটি সাধারণ বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। সে আমলের অনেক প্রাগ্রসর বাঙ্গালী যথা দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, রামগোপাল ঘোষ, মদনমোহন তর্কালঙ্কার প্রভৃতি সক্রিয়ভাবে এ প্রচেষ্টায় সহায়তা করেন। বিদ্যাসাগর এই বিদ্যালয়ের সম্পাদকরূপে দায়িত্ব গ্রহণ করেন ১৮৫০ সালের ডিসেম্বরে। এদেশবাসীর

মানসিক আচ্ছন্নতা ও প্রতিরোধ বিনষ্ট করার জন্য বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ মেয়েদের গাড়ীর দু'ধারে লিখে দিয়েছিলেন, 'কন্যাপেবং পালনীয়া শিক্ষনীয়াতিযত্নতঃ'; কিন্তু, এই শাস্ত্রবচন জীবনবোধকে সাংস্কৃতিক অধঃপতনের কলুষ থেকে, ন্যায়বুদ্ধিকে অন্ধবিশ্বাসের আক্রমণ থেকে এত সহজে রক্ষা করতে পারেনি, পারে না। তাই, বিদ্যালয়ে যাতায়াতের পথে মেয়েদের লক্ষ্য করে অভদ্র বিদ্রূপ, কুৎসিত শ্লেষ এবং কটূক্তি বর্ষিত হতে লাগলো; নাটুকে রামনারায়ণ ও ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত হালকা রসিকতায় বাবুদের বৈঠকখানা সরগরম করে তুললেন। সাংস্কৃতিক পরিবেশ খানিকটা তরল অঙ্গাবরণ ধারণ করলো।

কিন্তু, কালের অন্তরপ্রেরণা যাঁদের প্রাণশক্তিকে দুর্জয় করেছে, কর্মকে গতি দিয়েছে আর হৃদয়কে করেছে বিস্তৃত, তাঁরা পরাজিত হতে পারেন না। সমস্ত প্রতিরোধ উপেক্ষা করে বিদ্যালয় চলতে লাগলো। কিন্তু অল্পকাল পরেই বেথুনের মৃত্যু হয়। অন্যান্যদের মত বিদ্যাসাগরও মর্মাহত হলেন। কারণ, বেথুনের মধ্যে তিনি পেয়েছিলেন একজন উন্নতহৃদয় কল্যাণকামী ইংরেজকে, যিনি ভারতের লাঞ্ছিত মহিলাদের সমাজের স্বৈরাচারের বন্ধন থেকে মুক্ত করার স্বপ্ন দেখেছিলেন।

মৃত্যু দুঃখের হলেও আরব্ধ কর্ম নিরাশার উদ্যমহীনতায় ব্যর্থ হয়ে গেল না। ক্রমে সরকারী কর্তৃপক্ষও স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের আনুকূল্য করে নারীমুক্তি আন্দোলনকে আরও একধাপ অগ্রসর করে দিলেন। বিদ্যাসাগরের নতুনতর কর্মের আহ্বান এলো। সংস্কৃত কলেজ, বাংলা স্কুল, বিধবা বিবাহ, বাংলা সাহিত্য, জীবনকে অনাবিল মাধুর্যে প্রতিষ্ঠিত করার সমস্ত ক্ষেত্রেই বিদ্যাসাগর তখন অদ্বিতীয় পুরুষ। যুক্তি তাঁর সর্বাগ্রগণ্য, কর্ম তাঁর কালজয়ী। সংস্কৃত কলেজ পুনর্গঠন ও বাংলা স্কুল

প্রতিষ্ঠার পশ্চাতে ছিল যে উদ্দেশ্যের অনুপ্রাণনা, সেই একই উদ্দেশ্য-সিদ্ধির উন্মাদনায় তিনি ব্রতী হলেন বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায়। হ্রদের মত স্থির বাংলা সমাজজীবনে তিনি আনতে চাইলেন পদ্মার প্রমত্ততা। সরকারী অর্থাগার থেকে প্রয়োজনীয় অর্থ পাওয়া যাবে কি যাবে না, এই চিন্তায় বিন্দুমাত্র উৎকণ্ঠিত না হয়ে তিনি ১৮৫৭ সালের নভেম্বর থেকে ১৮৫৮ সালের মে—মাত্র এ কয়মাসে ৩৫টি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন ; মোট ১৩০০টি ছাত্রী বিদ্যালয়ে যাতায়াত করতে লাগলো। বাংলার নিভৃততম পল্লীতে এ এক অচিন্ত্যনীয় ব্যাপার,—জীবনের প্রবাহপথে নতুন দৃষ্টির আবির্ভাব।

বিদ্যাসাগর বলেছিলেন, এ-দেশের অজ্ঞানতমিস্রা দূর করার তাঁর যে ব্রত, তা উদ্‌যাপিত হবে তাঁর চিতাভস্মের মধ্য দিয়ে। বস্তুত তাই হয়েছিল তাঁর জীবনে। মধ্যজীবনে যে কর্মের সূত্রপাত, শেষদিন পর্যন্ত তার স্রোত অপ্রতিহত গতিতে প্রবাহিত হয়েছিল। সমাজ-প্রতিরোধ অতিক্রম করে যখনই কোন না কোন স্থানে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তখনকার প্রায় প্রত্যেকটি প্রচেষ্টার পশ্চাতেই ছিল বিদ্যাসাগরের অর্থ, নয় আশীর্বাদ।

॥ ৪ ॥

শিক্ষাবিস্তারের আন্দোলন, বিশেষতঃ স্ত্রী-শিক্ষাবিস্তারের আন্দোলন, বৃহত্তর সমাজ রূপান্তরের আন্দোলনের অঙ্গীভূত। বৃটিশ শাসনব্যবস্থার অভিঘাতে প্রাচীন সমাজের কাঠামো চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যাওয়ায় ব্যক্তির স্বকীয় সত্তা ও স্বাতন্ত্র্যের যেমন উন্মেষ হয়, তেমনি তার সঙ্গে সঙ্গে নারীমুক্তি সংগ্রামও অপরিহার্য রূপেই আত্মপ্রকাশ করে। মুখ্যতঃ স্ত্রীশিক্ষার প্রসার, এবং স্বামীমৃতা নারীর জীবনের অধিকারকে কেন্দ্র করেই এই সংগ্রাম অভিব্যক্তি লাভ করে। সতীদাহ প্রথা নিষিদ্ধ

হয় ১৮২৯ সালে ; এই নিষেধাজ্ঞা হিন্দু বিধবাকে জীবন্ত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করলো সত্য, কিন্তু জীবনের পথ তখনও অনাবিষ্কৃত। অবশ্য, সমাজ-বিধানের ও দেশাচারের কণ্টকাকীর্ণ পথ পরিষ্কার করে জীবনতীর্থে পৌঁছানোর উদ্যম সভায়-বৈঠকে দেখা যাচ্ছিল ; কাল তার জন্যও জমি প্রস্তুত করে রেখেছিল ; সেই উদ্যম কোন না কোন দিন প্রত্যক্ষ কর্মে প্রস্ফুটিতও হবে।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কর্মক্ষেত্রে আবির্ভূত হওয়ার অব্যবহিত পূর্ব-মুহূর্তে কৃষ্ণনগরের মহারাজ শ্রীশচন্দ্র এবং কলকাতায়ও দুচারজন প্রশস্ত-হৃদয় ব্যক্তি বিধবাবিবাহের চেষ্টাচরিত্র করেছিলেন, কিন্তু, তাঁদের প্রতিরোধ করে দাঁড়িয়েছিল দেশাচারের বিভীষিকা, এবং পণ্ডিত সমাজের প্রবঞ্চনাময় পাণ্ডিত্য ও ভ্রূকুটি। জ্ঞান ও সত্যের প্রতি যতোটা নিষ্ঠা ও অনুরাগ, চিত্তের যে ঔদার্য ও বিনয়, এবং চরিত্রের যতোটা সততা ও একাগ্রতা থাকলে মানুষের জ্ঞান ও কর্ম, আদর্শ ও ব্যবহার এক ও অভিন্ন হয়ে যায়, সেকালের অধিকাংশ পণ্ডিতেরই সেই নিষ্ঠা ও একাগ্রতা ছিল না। বিদ্যাসাগর স্বয়ং লিখছেন, 'যদি কেহ আমাকে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ভাবে, তাহাতে আমার যৎপরোনাস্তি অপমান বোধ হয়।' কলকাতার শ্যামাচরণ দাস নামক এক কর্মকার তার বালবিধবা কন্যার পুনর্বার বিবাহ দেওয়ার ইচ্ছায় পণ্ডিত সমাজের মতামত প্রার্থনা করেন। এবং সেকালের বিখ্যাত ধর্মশাস্ত্র ব্যাখ্যাতাগণ, যথা মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশ, ভবশঙ্কর বিদ্যারত্ন, কাশীনাথ তর্কালঙ্কার, রামতনু তর্কসিদ্ধান্ত প্রভৃতি বিধবাবিবাহ শাস্ত্রসম্মত বলে বিধান দান করেন ; কিন্তু পরবর্তীকালে তাঁদের প্রায় সকলেই বিধবাবিবাহের বিরোধিতা করেন। ভবশঙ্কর বিদ্যারত্ন বিধবাবিবাহের পক্ষ সমর্থন করে নবদ্বীপের স্মার্ত পণ্ডিত ব্রজনাথ বিদ্যারত্নকে তর্কবিচারে পরাজিত করেন, এবং

পুরস্কারস্বরূপ শোভাবাজার রাজদরবারে এক জোড়া শাল উপহার লাভ করেন—অথচ ব্যবহারিক ক্ষেত্রে তিনি সর্বত্র তার বিরোধিতা করেন(১১)। পাণ্ডিত্যের এইরূপ শঠতা, ব্যবস্থা ও আচরণের এই বৈপরীত্য, ধর্মভীরু মানুষকে স্বভাবতই বিমূঢ় করে রেখেছিল,—অথচ সামাজিক ভাব-পরিমণ্ডলে যেটুকু মানবিক বোধ জাগ্রত হয়েছে, কল্যাণচিন্তায় মন যেটুকু সুস্থ হয়েছে, তা সমাজের অন্যায় বন্ধন থেকে মুক্তিলাভের জন্য চঞ্চল। ইংরেজী শিক্ষার মাধ্যমে পাওয়া সামাজিক রাজ-নৈতিক 'অধিকার' সংক্রান্ত আলোচনায় সাংস্কৃতিক পরিবেশ বিক্ষুব্ধ। বৃটিশ আইনের ও পশ্চিমী ন্যায় শাস্ত্রাদির সার্বভৌম আদর্শ বাংলার সমাজজীবনে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য প্রাগ্রসর বাঙ্গালীরা অস্থির। পুরুষ হিসেবে যে সব 'অধিকার' ও সুবিধা তারা ভোগ করছেন, মেয়েরাও তার অধিকারী হোক—যুক্তির দিক থেকে এ সিদ্ধান্ত তারা বহু পূর্বেই মেনে নিয়েছেন। অভাব শুধু সাহসের, সঙ্কল্পের, এবং সত্যাশ্রয়ী নির্মল পাণ্ডিত্যের—পাণ্ডিত্যাভিমানীর প্রবঞ্চনাময় ভ্রূকুটিকে যা অবহেলায় জয় করতে পারে।

বাংলা সমাজজীবনের ক্ষেত্রে বিদ্যাসাগর সে অভাব পূরণ করলেন। মন তাঁর বহু পূর্ব থেকেই প্রস্তুত হয়েছিল। তাঁর অধ্যাপক শম্ভুচন্দ্র বাচস্পতি মহাশয় জরাগ্রস্ত বার্ধক্যে যখন একটি তরুণীকে পত্নীরূপে গ্রহণ করেন, তখন সেই তরুণীর ভবিষ্যৎ চিন্তা করে ক্ষোভে দুঃখে ঘৃণায় বিদ্যাসাগর বাচস্পতির গৃহে জলস্পর্শ করতে অস্বীকার করেছিলেন। দুর্জয় সঙ্কল্প ও সুকঠিন অধ্যবসায়ের সাহায্যে তিনি বিধবাবিবাহের পক্ষে

---

(১১) চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের "বিদ্যাসাগর" গ্রন্থে এ সম্পর্কে বিস্তৃত বিবরণ আছে

শাস্ত্রপ্রমাণ উদ্ধার করে আর্কিমিডিসের মত "ইউরেকা ইউরেকা" বলে আত্মহারা হলেন ; ১৮৫৫ সালে প্রথমে ক্ষুদ্রাকারে পরে বৃহদাকারে বিধবাবিবাহ সম্পর্কিত প্রস্তাব প্রকাশিত হ'লো। দেশময় সমাজবিপ্লবের এই তরঙ্গ প্রবাহিত হ'তে লাগলো ; বিধবাবিবাহের সমর্থক এবং বিরোধীপক্ষের কণ্ঠকে আশ্রয় করে এই বার্তা দেশ দেশান্তরে ছড়িয়ে পড়লো। মাঠে-ময়দানে, সহরে-গ্রামে, সর্বত্র বিদ্যাসাগর ও বিধবা-বিবাহ, শান্তিপুরের কাপড়ের পাড়ে, চাষীর কণ্ঠে, গ্রাম্যচারণের সঙ্গীতে বিদ্যাসাগর ও বিধবাবিবাহ ; আর শতসহস্র নীরব কণ্ঠে অযুত আশীর্বাদ।

সত্যের উপলব্ধি বিদ্যাসাগর-মানসে হয়েছিল নিরঙ্কুশ ও পরিপূর্ণ। তাই এখানে জ্ঞান ও কর্মে, বোধ ও বুদ্ধিতে, উপলব্ধি ও আচরণে কোন বৈপরীত্য অথবা বিরোধ নেই ; আদর্শ ও ব্যবহারিক জীবন অখণ্ড মৈত্রীবন্ধনে বাঁধা, এক। সেজন্যই বিধবাবিবাহের শাস্ত্রীয় প্রমাণ উদ্ধার করেই তিনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারলেন না ; সমাজজীবনে তাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য অগ্রসর হলেন। ১৮৫৫ সালেই ঐ বিবাহকে আইনসিদ্ধ বলে ঘোষণা করার জন্য সরকার সমীপে আবেদনপত্র প্রেরিত হ'লো—কয়েক হাজার লোক বিভিন্ন আবেদনপত্রে স্বাক্ষর করেন। সেকালের প্রাগ্রসর বাঙ্গালী জননায়কদের প্রায় সকলেই আবেদনপত্রে স্বাক্ষর করেন ; বর্ধমানের মহারাজা, নবদ্বীপের মহারাজা, পূর্ববাংলার অনেক জমিদার, প্রসন্নকুমার ঠাকুর প্রভৃতিও অন্যান্যদের সঙ্গে মিলিত হয়ে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ভাবে অনুরূপ প্রার্থনা জানিয়ে আবেদন করেন। এদিকে রক্ষণশীল হিন্দুসমাজও নিশ্চেষ্ট ছিল না। রাজা রাধাকান্ত দেবকে সম্মুখে রেখে বিভিন্ন স্থানের পঞ্চাশ সহস্রাধিক লোক বিধবা-বিবাহের বিরোধিতা করে সরকার সমীপে আবেদন করেন। তাঁদের

সম্ভবত আশা ছিল, সংখ্যার ভারে সত্যের কণ্ঠরোধ সম্ভব হবে, এবং সামাজিক অগ্রগতিকে ব্যাহত করা যাবে।

কালের হৃদয়-সংকেত তাঁদের জানা ছিল না, আর জানা ছিল না যে, ভারতে ইংরেজের প্রাগ্রসর ভূমিকা তখনও নিঃশেষ হয়ে যায় নি। রাজা রাধাকান্ত দেব প্রভৃতির আবেদনপত্র ইংরেজ রাজপুরুষদের কৌতুক উৎপাদন করেছে শুধু। আইনসভায় বিধবাবিবাহ আইনের প্রস্তাবক গ্র্যাণ্ট সাহেব হৃদয়গ্রাহী ও আবেগপূর্ণ ভাষায় আইনের স্বপক্ষে বক্তৃতাপ্রসঙ্গে একস্থানে ঘোষণা করেন, ঐ আইন কোনই কাজে লাগবে না এমনও যদি হয়, তথাপি শুধু ইংরেজ নামের গৌরবের জন্যই এ আইন পাশ করা উচিত। তিনি আরও বলেন, এই আইন কারো বিশ্বাস-অবিশ্বাসে হস্তক্ষেপ করবে না, কিন্তু একদল হিন্দু আরেক দল হিন্দুর উপর যে অত্যাচার উৎপীড়ন করেন তা নিবারণ করবে। ('It will interfere with the tenets of no human being ; but it will prevent the tenets of one set of men from inflicting misery and vice upon the families of their neighbours, who are of a different and more humane persuasion.')

বিদ্যাসাগর মহাশয় ইংরেজী সামাজিক ন্যায়শাস্ত্রাদি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে অধ্যয়ন করার অবসর পেয়েছিলেন কিনা জানি না ; না পেয়ে থাকলেও ইংরেজের শাস্ত্র-স্বীকৃত মানবিক বোধ ও যুক্তিবাদ পরিপূর্ণরূপে আত্মস্থ করেছিলেন, তাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নেই। তাঁর চিন্তা, মনন ও যুক্তিতে ইংরেজ-সম্মত যুক্তিবাদের প্রভাব সবিশেষ লক্ষ্যণীয়। ইংরেজের ন্যায়শাস্ত্রাদিতে মানুষকে যে দৃষ্টিতে দেখা হয়েছে, এবং তার সামাজিক অধিকারাদি সম্পর্কে যে অঙ্গীকার দেওয়া আছে, হিন্দু বিধবাদের জন্য

সেই অধিকারই তিনি অর্জন করতে চেয়েছিলেন ভারতীয় সমাজের বিধায়কদের নিকট থেকে, অবশ্যই বৃটিশ আইনের সাহায্যে। এই চাওয়ার মধ্যে কালের অন্তর-প্রেরণাই অভিব্যক্তি লাভ করেছিল। বৃটিশ শাসন ভারতবর্ষকে পৃথিবীর পথে টেনে নিয়ে গিয়েছে, তার জাতীয় জীবন আর ভৌগোলিক সীমায় আবদ্ধ নেই, আবদ্ধ থাকবে না, ভারতবর্ষকে বিশ্বমুখী হতেই হবে,—কালের এই আত্যন্তিক প্রেরণাও বিদ্যাসাগর-মানসে সদাজাগ্রত ছিল। (১২) বিধবাবিবাহ বিধিসম্মত করার জন্য তাঁরা সমবেতভাবে যে আবেদন করেন, তাতে অন্যান্য যুক্তির মধ্যে একথাও ছিল যে, এইরূপ বিবাহ প্রকৃতিবিরুদ্ধ নয়, পৃথিবীর অন্য কোন দেশে অথবা জাতির আইন বা দেশাচারে ইহা নিষিদ্ধও নয় ('Such marriages are neither contrary to nature nor prohibited by law or custom in any other country or by any other people in the world.') এখানেও নিজের দেশ ও জাতিকে সংশোধিত ও উন্নততর করে, পৃথিবীর অন্যান্য জাতির ও দেশের সমপর্যায়ভুক্ত হওয়ার, বোধ, বুদ্ধি, উদারতায় অন্যান্য সকলের পাশে দাঁড়ানোর আকাঙ্ক্ষা, বিশ্ববাসীর সহিত মিলিত হওয়ার আকুতি।

যুগধর্মসম্মত ছিল বলেই সংখ্যায় গরিষ্ঠ না হলেও বিদ্যাসাগর

(১২) ইংরেজ সংসর্গের প্রয়োজনীয়তা তিনিও বিশেষভাবে উপলব্ধি করেছিলেন। তিনি মনে করতেন, 'বহুকাল ইঙ্গরেজী বিদ্যার সবিশেষ অনুশীলন ও ইঙ্গরেজ জাতির সহিত ভূয়িষ্ঠ সংসর্গ দ্বারা, কলিকাতায় ও কলিকাতার অব্যবহিত সন্নিহিত স্থানে কুপ্রথা ও কুসংস্কারের অনেক অংশে নিবৃত্তি হইয়াছে।' (বহুবিবাহ, প্রথম প্রস্তাব) গ্রামাঞ্চলে তা হয় নি বলে তাঁর দুঃখ ছিল।

মহাশয়দের আবেদন ১৮৫৬ সালের জুলাই মাসে মঞ্জুর করা হয়। সঙ্গে সঙ্গে তিনি কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন—ছ'মাসের মধ্যেই অন্যতম বন্ধুবর শ্রীশ বিদ্যারত্ন সর্বপ্রথম বিধবা বিবাহ করেন। অল্প ব্যবধানের মধ্যে আরও কয়েকটি বিধবাবিবাহ অনুষ্ঠিত হয়। সে আমলের প্রায় সমস্ত কল্যাণধর্মী সমাজহিতৈষী বাঙ্গালী এ ব্যাপারে অগ্রণী হয়ে নানাভাবে সহায়তা ও আনুকূল্য করেন। বহুবিধ সামাজিক লাঞ্ছনা, উৎপীড়ন ইত্যাদি সহ্য করে নতুন যাত্রার পথ পরিষ্কার করে যান। কিন্তু, সমস্ত কর্মের ইতিহাসে যেমন এক্ষেত্রেও তাই, সময়ের প্রবাহের সঙ্গে ধীরে ধীরে উৎসাহে ভাঁটা পড়তে লাগলো, যারা অর্থসাহায্য করতেন তাঁরা পূর্বের ন্যায় সাহায্য করতে পারলেন না, যাঁরা ছিলেন কর্মীবন্ধু, তাঁরাও দীর্ঘকাল হৃদয়কে প্রসারিত করতে পারলেন না। একমাত্র বিদ্যাসাগরের সঙ্কল্পের অনির্বাণ শিখা অম্লানভাবে জ্বলতে লাগলো। ঋণের মাত্রা দিন দিন বৃদ্ধি পেতে থাকলো, প্রতারিত হলেন, মিথ্যা হৃদয়বৃত্তির পরিচয়ে কামাতুর ব্যক্তি একাধিক বিবাহ করে নিল তাঁর অজ্ঞাতে, সামাজিক ক্ষেত্রে লাঞ্ছিত হলেন, কিন্তু মাথাও নত হলো না, কর্মও স্তব্ধ হলো না। বিধবাবিবাহের দাবীর নিকট জীবনের আর সব কিছু তুচ্ছ হয়ে গেল। নারীজাতির সামাজিক অধিকার প্রতিষ্ঠা, এবং প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ভারতীয় সমাজকে আধুনিক কালোপযোগী কল্যাণধর্মিতার আদর্শ দ্বারা গতিশীল করার জন্য তাঁর অকুতোভয় চিত্ত আজীবন সংগ্রাম করে গেল। মাইকেল মধুসূদন যে বলেছিলেন, বিদ্যাসাগরের ছিল 'the genius and wisdom of an ancient sage, the energy of an English-man, and the heart of a Bengalee mother', তার পরিপূর্ণ অভিব্যক্তি দেখি বিধবাবিবাহ আন্দোলনে রত বিদ্যাসাগরের মধ্যে।

ঠিক একই সময়ে বহু বিবাহ বন্ধ করার সামাজিক আন্দোলনও আরম্ভ

হয়। ১৮৫৫ সালেই, বিধবাবিবাহের আবেদনপত্রের মাত্র আড়াই মাস বাদেই সহস্র লোকের স্বাক্ষর সম্বলিত পত্র সরকার সমীপে প্রেরিত হলো,—বহু বিবাহ আইনবলে নিষিদ্ধ করা হোক। বিদ্যাসাগর ও অন্যান্যদের লক্ষ্য ছিল কৌলিন্য প্রথা। বৃটিশ আইনের সাহায্যে তাঁরা এই প্রথা-আশ্রয়ী সামাজিক কলুষ থেকে বাংলা দেশকে উদ্ধার করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু, সম্ভবত রাজনৈতিক কারণে, সরকারের পক্ষে এই আইন প্রণয়ন সম্ভব হলো না। আন্দোলন চলতে থাকলো,—কয়েক বৎসর বাদে ১৮৬৬ সালে পুনরায় সরকার সমীপে আবেদপত্র পেশ করা হলো—একুশ হাজার লোক তাতে স্বাক্ষর করলেন। এবারও ফল হলো না। বিদ্যাসাগর অন্য পন্থা অবলম্বন করলেন ; কুলীন ব্রাহ্মণদের মধ্যে সর্বদ্বারী বিবাহ প্রথা চালু করে বহু বিবাহের পথ বিনষ্ট করার জন্য, এবং পরবিত্তভোগী কুলীনদের অত্যাচার থেকে নারীদের মুক্ত করার জন্য কুলীন সমাজের চূড়ামণিদের নিকট পত্র লিখলেন। ১৮৭১ সালে তাঁর 'বহু বিবাহ রহিত হওয়া উচিত কিনা' প্রথম পুস্তক, ১৮৭৩ সালে দ্বিতীয় পুস্তক প্রকাশিত হয়। কৌলিন্যপ্রথার ও দেবীবর ঘটকের মেল-বন্ধনের কল্যাণে কী পরিমাণ সামাজিক অনাচার, দুর্নীতি, ব্যভিচার এবং আনুষঙ্গিক নারী-নির্যাতন জমে ওঠেছে, কয়েকটি অঞ্চলের কুলীন ব্রাহ্মণদের ব্যক্তিগত জীবন-ইতিহাস থেকে বিদ্যাসাগর তা জনসমক্ষে তুলে ধরেন। এই কলুষ-চিত্রের পশ্চাতে বিদ্যাসাগর-হৃদয়ের কী আর্তি, কী অপরিসীম বেদনা, সামাজিক অচলায়তন বিনষ্ট করে আধুনিক কালসম্মত মানবিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করার কী সুমহান আগ্রহ! তাঁর প্রচেষ্টা সার্থক হয় নি। ইংরেজের উপর যে অবিচল বিশ্বাসে বলীয়ান হয়ে তিনি এই আন্দোলন করছিলেন, সে বিশ্বাস ক্ষুণ্ণ হয়েছে বলে তাঁর ক্ষোভের অন্ত ছিল না। তিনি দুঃখভরে লিখেছিলেন, 'যে

ইঙ্গরেজ জাতি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া, রাজ্যভ্রংশভয় অগ্রাহ্য করিয়া, প্রজার দুঃখ বিমোচন করিয়াছেন, এক্ষণে স্বতঃপ্রবৃত্ত হওয়া দূরে থাকুক, প্রজারা বারংবার প্রার্থনা করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারে না। হায়!' (১৩) শোনা যায়, একবার ইংল্যাণ্ড যাওয়ার ইচ্ছা ছিল তাঁর,—শুধু একথা জিজ্ঞাসা করার জন্যে, মহারাণী ভিক্টোরিয়া যে দেশের সম্রাজ্ঞী, সে দেশের নারীদের এই লাঞ্ছনাভোগ করতে হয় কেন?

এই সব কর্মের মাধ্যমে বিদ্যাসাগর নতুন জীবনাদর্শ, মানবিক বোধ ও উপলব্ধিতে উপনীত হয়েছিলেন, অথবা একথাও বলা যেতে পারে, বিদ্যাসাগর-চিত্তে এই বোধের উন্মেষ হয়েছিল বলেই তাঁর পক্ষে ঐ সব সামাজিক কর্মে আত্মোৎসর্গ করা সম্ভব হয়েছে। এই বোধ ও উপলব্ধির মূল কথা, জাগতিক সম্পর্কের মধ্যে মানুষের মানবতার অম্লান স্বীকৃতি। মানুষকে স্বীকার করতে হ'বে; এবং তাকেই সমস্ত কর্মের উৎস এবং লক্ষ্য বলে উপলব্ধি করতে হ'বে। এই মানুষের কোন জাত নেই, কোন ধর্ম নেই; তার একমাত্র পরিচয়, সে মানুষ। অর্থের পরিমাপে নয়, ধর্মীয় বিশ্বাস-অবিশ্বাসের বিচারে নয়, সামাজিক বিধিব্যবস্থার গরিমায় নয়, সব কিছুর বন্ধন উত্তীর্ণ হয়ে থাকে যে মানুষ, তাকেই স্বীকার ও গ্রহণ করা। এবং বাস্তব পৃথিবীতেই তার জীবন-তৃষ্ণাকে রূপায়িত করা,—সৃষ্টির, আনন্দের ও ভোগের যে আকাঙ্ক্ষায় তার দেহ-মন চঞ্চল হয়ে ওঠে, তার সার্থক পরিতৃপ্তি সাধন।

বলা বাহুল্য, এই উপলব্ধি এবং বোধও কালের অন্তর-প্রেরণাসম্মত।

(১৩) বহু বিবাহ: প্রথম প্রস্তাব

পূর্বেই উল্লেখিত হয়েছে যে, ইংরেজের কণ্ঠকে আশ্রয় করে তৎকালীন ইউরোপীয় প্রাগ্রসর চিন্তা ও আদর্শ ভারতবর্ষে বিস্তৃতিলাভ করেছিল। ঐ আদর্শ প্রকৃতিতে বুদ্ধিবাদী, ব্যবহারে মানবতাবাদী। ঐ আদর্শের মূল সুরে পারত্রিক কল্যাণচিন্তা যেমন অনুপস্থিত, এই জগৎকে সত্য বলে গ্রহণ করে ভোগে ও ঐশ্বর্যে সর্বভাবে জীবনকে চরিতার্থ করার আগ্রহও তেমনি বলিষ্ঠ। ভারতবর্ষে ইংরেজ ও ইংরেজী শিক্ষা এই মনোভঙ্গির উপযোগী আবহাওয়া সৃষ্টি করে রেখেছিল। ইংরেজের আইন এবং নীতিশাস্ত্রাদির আদর্শও ছিল সার্বজনীন। অধ্যয়ন-অধ্যাপনায় যতোটা না হোক, প্রত্যক্ষ যোগাযোগ, অসামান্য সংবেদনশীল চিত্ত এবং কালপ্রবাহকে আত্মস্থ করার চৈতন্য দ্বারা বিদ্যাসাগর স্বীয় জীবনে সেই আদর্শকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিলেন। রামমোহনের বিশুদ্ধ তাত্ত্বিক উপলব্ধি বিদ্যাসাগরের ব্যবহারিক কর্মে পরিণতি লাভ করে। এবং দ্রষ্টা রামমোহন স্রষ্টা বিদ্যাসাগরে। তাঁর চরিত্রের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ও লক্ষ্যণীয় যে বৈশিষ্ট্য—জ্ঞান ও কর্মের, বোধ ও ব্যবহারের ঐক্য ও অভিন্নতা—তা-ই তাঁকে নিজস্ব জীবনের ক্ষুদ্র সীমা থেকে বৃহত্তর সমাজজীবনের প্রশস্ত পরিধির মধ্যে টেনে নিয়ে যায়। মানবিক কল্যাণসাধন কর্মে তিনি আত্মনিয়োগ করেন।

তাঁর কর্মই তাঁর বাণী। বিদ্যাসাগর-মানসে কর্মের যে স্থান তা বিশ্লেষণ করলে এ সিদ্ধান্তেই উপনীত হতে হয় যে, তিনি সত্যের কোনরূপ দেশাতীত কালাতীত অতীন্দ্রিয় সত্তা স্বীকার করতেন না, অথবা স্বীকার করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করতেন না। সত্য বাস্তব, এবং প্রত্যক্ষ সমাজজীবনের বিচিত্র সম্পর্কজাত। এবং তাকে উপলব্ধিও করতে হ'বে এই সম্পর্কের মধ্যেই। নিরন্তর প্রবাহিত-হতে-থাকা

সমাজজীবন তাঁর সম্মুখে একের পর এক যে সমস্যা তুলে ধরেছে, তাকে আত্মগত করা, সমস্যার সমাধান উদ্ভাবন এবং সমাধানের পথে সেই কালের মানুষের জীবনকে সৃষ্টির সৌন্দর্যে মণ্ডিত করা,—সত্যের স্বরূপ তার মধ্যেই নিহিত। এই সত্যের ধ্যানই বিদ্যাসাগরের ধ্যান। তিনি চলমান বর্তমান কালকেই উপলব্ধি করতে চেয়েছিলেন ভবিষ্যৎকে সৃষ্টি করার জন্য। বাস্তবনিরপেক্ষ কোন তত্ত্ব বা আদর্শ দিয়ে ভবিষ্যৎকে সৃষ্টি করা যাবে না, তাকে সৃষ্টি করতে হলে বাস্তব জীবনের প্রত্যক্ষ সত্যকে জানতে হবে। বিদ্যাসাগর তত্ত্ব-আলোচনায় নয়, কর্ম দিয়ে তা প্রমাণ করেছেন। প্রবাহিত জীবনধারার স্রোতে অবগাহন না করলে সত্যের বোধ কখনও পূর্ণ হতে পারে না।

বিদ্যাসাগর এই সত্যকেই উপলব্ধি করার চেষ্টা করেছেন আজীবন। এখানে তাঁর জীবনের দু'একটি ঘটনার উল্লেখ না করে পারছি না :

……১৮৬৭ সাল, দেশময় দুর্ভিক্ষ। বিদ্যাসাগর নিজ গ্রামে অন্নসত্র খুললেন ; যতো অর্থব্যয় হয় হোক, যতো পাচক ও পরিচারক নিয়োগ করতে হয় হোক, কেউ যেন অভুক্ত না থাকে,—অহোরাত্র রন্ধন ও পরিবেশন চলতে লাগলো। কিন্তু, প্রত্যহ খেচরান্নে তৃপ্তি হয় না, আশ্রয়প্রার্থীরা বিদ্যাসাগর সমীপে আবেদন করলো—সপ্তাহে একদিন ভাতের ব্যবস্থা হ'লো। তিনি স্বয়ং অন্নসত্রবাসী হাড়ি ডোম প্রভৃতি নিম্নবর্ণের মেয়ে-পুরুষের মাথায় তেল মাখিয়ে দিচ্ছেন, আসন্ন-প্রসবা নারীদের মনোরঞ্জনের জন্য প্রসবপূর্ব স্ত্রী আচারাদিরও অনুষ্ঠান করলেন।

……১৮৬৮ সালে স্বাস্থ্যোদ্ধারের আশায় তিনি বর্ধমানের কমলসায়ার নামক প্রমোদভবনে আছেন ; নিকটেই দীনদরিদ্র মুসলমান পল্লী ; মুসলমান শিশুদের মাধ্যমে ধীরে ধীরে হৃদ্যতা, তারপর অভাবমোচনের জন্য অকৃপণ অর্থব্যয়। তার পরের বৎসর ম্যালেরিয়ার প্রকোপে সমগ্র

বর্দ্ধমান বিধ্বস্ত হওয়ার উপক্রম, সরকারী সাহায্যের ব্যবস্থা অপ্রতুল; বিদ্যাসাগর দাতব্য ঔষধালয় প্রতিষ্ঠা করলেন; 'বর্দ্ধমানের অসংখ্য লোক যখন মৃত্যুমুখে পতিত, বিপন্ন ও শ্রীভ্রষ্ট, বিদ্যাসাগর মহাশয় তখন দরিদ্র-জনের দ্বারে দ্বারে জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে সকলের ঔষধ পথ্যের ব্যবস্থা করিয়া বেড়াইতেছেন। অনেকে দেখিয়াছেন, কৃশ ও রুগ্ন মুসলমান শিশু-সন্তান তাঁহার পবিত্র ক্রোড়ে স্থান পাইয়াছে, কেহ বা আত্মচেষ্টায় তাঁহার ক্রোড়ে উঠিবার চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু তাহাতে তাঁহার উপবীত ও উপবীত পরিশোভিত দেহ অপবিত্র হয় নাই।'

……কর্মাটাঁড়ে তাঁর সাঁওতাল বন্ধুরা আসছেন একের পর এক, 'বিদ্দেসাগর, আমার অত গণ্ডা পয়সা দরকার, তুই আমায় পয়সা দে আমার ভুট্টা কটা নে।' এমনি করে ভুট্টা স্তূপীকৃত হ'লো, আবার খানিক বাদে আরেক দল বন্ধু এলেন, 'বিদ্দেসাগর, খেতে দে!' ভুট্টার স্তূপ নিঃশেষ হয়ে গেল। সময় অসময়ের বিচার নেই, বাড়ী বাড়ী ফিরছেন হোমিওপ্যাথির বাক্স নিয়ে; তাদের তৃপ্তির জন্য বর্দ্ধমান থেকে মিষ্টি এলো, কলকাতা থেকে কয়েক বস্তা খেজুর এলো, সাঁওতাল সন্তানদের জন্য বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হ'লো।…

আজীবন কর্মসমুদ্রে নিমগ্ন বিদ্যাসাগর-জীবন থেকে কয়েকটি ঘটনার আভাস দেওয়া হ'লো মাত্র, শুধু এইটুকু প্রতিপন্ন করার জন্য যে, কী অনন্যসাধারণ মানবিক বোধে তাঁর মন উদ্বুদ্ধ হয়েছিল। ইংরেজের আইন এবং ন্যায় শাস্ত্রাদির যে সার্বভৌম আদর্শ, রামমোহন তত্ত্ববিচারে যে সার্বভৌম মানবিক আদর্শে উপনীত হয়েছিলেন, বিদ্যাসাগর ব্যবহারিক জীবনে সেই আদর্শ সংস্থাপন করলেন। বিদ্যাসাগরে এসে তত্ত্ব ও জীবন এক হয়ে গেল। অথচ এই আদর্শের মধ্যে পারলৌকিকতার কোন স্পর্শ নেই। শিক্ষায়-দীক্ষায় মানুষের মনকে উন্নীত করে, সামাজিক

অধিকারাদি দান করে, এবং আর্থিক অসুবিধা দূর করে তার আত্ম-বিকাশের পথকে সহজ সুগম করা,—এই সব কর্মের ভিতর দিয়ে তিনি সর্বগামী হওয়ার চেষ্টা করছেন। এবং একটা সর্বগামী সামাজিক আদর্শ সংস্থাপন করছেন।

জীবনের লক্ষ্য ও সাধনা কি, এর পরিণতি বা স্বরূপ কি, এসব সমস্যা সম্পর্কে তাত্ত্বিক বা দার্শনিক আলোচনা তিনি কখনও করেননি এবং করার প্রয়োজনীয়তাও অনুভব করেননি, নিজস্ব কর্ম ও মনোভাবের গভীর সামাজিক মূল্য সম্পর্কে তিনি সচেতন ছিলেন কিনা বলা কঠিন। তবে, তাঁর কর্ম যেমন নিঃসঙ্কোচ, দ্বিধাহীন ও পৌরুষ-দৃপ্ত তাতে মনে হয়, বাস্তব মানুষের জীবনতীর্থে উপনীত হওয়াই যেন তাঁর আদর্শ। গ্রামে গ্রামে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাই হোক, হিন্দু বিধবার পুনর্বিবাহ-ই হোক, আর জাতিধর্মহীন আর্তের সেবাই হোক, সমস্ত কর্মের পশ্চাতে যেন এই উদ্দেশ্য ক্রিয়াশীল—জীবনতীর্থে উপনীত হওয়া, মানুষের অধিকারে বঞ্চিত মানুষকে সেই অধিকারে প্রতিষ্ঠিত করা। এইজন্যই তাঁর কর্মোদ্যম, অর্থব্যয়। এ এক অপূর্ব জীবনবাদ, অবশ্যই ইউরোপের আশীর্বাদ-পাওয়া। এই পৃথিবীকে চরম ও পরম বলে স্বীকার করে তারই নিত্য পরিবর্তনশীল সম্পর্কের মধ্যে জীবনকে উপলব্ধি ও সৃষ্টি করার আকাঙ্ক্ষা—ভোগ, ঐশ্বর্য, সজীব মানবিক বোধ ও সরস হৃদয়বৃত্তির সাহায্যে নিজের ও সমস্ত মানুষের জীবনকে সমৃদ্ধ করার বাসনা। এই জীবনবাদই তাঁর অনুভূতিকে করেছে প্রখর, কর্মকে দুর্বার এবং পৌরুষকে করেছে অকুতোভয়। এই জীবনবাদই তাঁকে কখনও এই মর্ত্য পৃথিবীর বাইরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে দেয়নি।

সত্যই, ভাবতে আশ্চর্য লাগে, যাঁর জন্ম হয়েছিল সনাতন ব্রাহ্মণ পরিবারে, যিনি বার বৎসর সংস্কৃত শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করেছিলেন, চটিজুতা

ও চাদর যিনি কখনও পরিত্যাগ করেলন না, তাঁর চিত্ত কখনও পারমার্থিক অথবা জীবন্মুক্তি অথবা ব্রহ্ম-সাযুজ্য লাভের দুশ্চিন্তায় উদ্বিগ্ন হয়নি। একদিনের জন্যও ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসায় চঞ্চল হয়নি। বরং তাঁর জীবদ্দশায় তিনি ধর্মবিশ্বাসহীন, এমনকি নাস্তিক বলে আখ্যাত হয়েছিলেন। ধর্মবিশ্বাসহীনতার অভিযোগ বহুলাংশে সত্য হওয়াই স্বাভাবিক। 'তত্ত্ববোধিনী সভার' তিনি ছিলেন অন্যতম সদস্য, তিনিই সভার সর্বশেষ সম্পাদক। সভার চিন্তানায়ক অক্ষয় কুমার দত্ত তাঁর পরম বন্ধু; দত্ত মহাশয়ের নেতৃত্বে তখন সভার সভ্যবৃন্দ গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে অর্থাৎ ভোটের সাহায্যে ঈশ্বরের স্বরূপ ইত্যাদি নিরূপণ করতেন। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এ সম্পর্কে অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হয়ে লিখেছিলেন, 'একজন বলিলেন, 'ঈশ্বর আনন্দস্বরূপ কিনা? যাহার যাহার আনন্দ-স্বরূপে বিশ্বাস আছে, তাহারা হাত উঠাইল। এইরূপে অধিকাংশের মতে ঈশ্বরের স্বরূপের সত্যাসত্য নির্দ্ধারিত হইত।' আরও, 'এখানে যাঁহারা আমার অঙ্গ স্বরূপ, যাঁহারা আমাকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছেন, তাঁহাদের অনেকের মধ্যে আর কোন ধর্মভাব ও নিষ্ঠাভাব দেখিতে পাই না।' অপরাধীদের তালিকায় সম্ভবত বিদ্যাসাগরের নামও ছিল, এবং থাকা খুবই স্বাভাবিক। ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রাদিতে তাঁর বিশ্বাস ছিল না; তাছাড়া, তাঁর পূর্বোক্ত জীবনবাদই তাঁকে কোন অতীন্দ্রিয় সত্তার অনুসন্ধান থেকে বিরত রেখে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পৃথিবীর সন্ধানে ব্যাপৃত করেছে। এই পৃথিবীই তাঁর সাধনার তীর্থক্ষেত্র; এবং সাধনার লক্ষ্য মানুষ।

তৎকালীন সমাজপরিবেশে এই আদর্শ অভিনব। প্রচলিত হিন্দু ধ্যানধারণার বিপরীতপন্থী। রক্ষণশীল হিন্দুসমাজ যখন তার ব্রহ্মকে বাঁচানোর উৎকণ্ঠায় উদ্‌গ্রীব, বিদ্যাসাগর তখন ব্রহ্মের পথ থেকে মানুষকে

ফিরিয়ে এনে প্রত্যক্ষ জীবনের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য উদ্‌ভ্রান্ত। ব্রহ্ম-সাযুজ্য লাভ তাঁর জীবনে মানব-সাযুজ্য লাভে রূপান্তরিত হয়েছে, এবং তারই চিন্তায় তিনি সর্বদা নিজেকে নিয়োজিত রেখেছেন। জীবনে একদিনের জন্যও বিভ্রান্ত হননি, এবং যা কিছু অচল, জীর্ণ ও পুরাতন তার বিরুদ্ধে সংগ্রামে ক্লান্ত হননি। 'একদিকে স্বার্থপরতা, জড়তা, মূর্খতা, অন্যদিকে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। একদিকে বিধবাদের উপর সমাজের অত্যাচার, পুরুষের হৃদয়শূন্যতা, নির্জ্জীব জাতির নিশ্চলতা, অন্যদিকে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। একদিকে শত শত বৎসরের কুসংস্কার ও কুরীতির ফল, অন্যদিকে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। একদিকে নির্জ্জীব, নিশ্চল, তেজোহীন বঙ্গসমাজ, অন্যদিকে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।'(১৪) এই সংগ্রামে আপোষের কোন স্থান ছিল না। যুগ যুগ ধরে চলতে-থাকা একটা সামাজিক আদর্শের বিরুদ্ধে এমনি বিদ্রোহ ও একক সংগ্রাম ইতিহাসে দুর্লভ।

॥ ৬ ॥

বিদ্যাসাগর মহাশয় ভারতে ইংরেজবিজয়ের উপস্থিত এবং ভবিষ্যৎ ফলাফল, ইঙ্গ-ভারতীয় সম্পর্ক, এ-দেশে ইংরেজের থাকা-না-থাকা ইত্যাদি রাজনৈতিক সমস্যা সম্পর্কে কোনরূপ আলোচনা করেননি কখনও, সম্ভবত আলোচনার কোন আত্যন্তিক প্রয়োজনীয়তাও কখনও অনুভব করেননি। বৃটিশ শাসন সম্পর্কে তাঁর সুস্পষ্ট অভিমত তাই অভিব্যক্ত দেখতে পাওয়া যায় না। তবে, বিবিধ সামাজিক ও রূপান্তর-ধর্মী কর্মে তিনি ইংরেজের উপর যে বিশ্বাস স্থাপন করেছেন, এবং

---

(১৪) রমেশচন্দ্র দত্তের উক্তি ; চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বিদ্যাসাগর' গ্রন্থে উদ্ধৃত।

তাঁদের শুভবুদ্ধির উপর যতো নির্ভরশীল ছিলেন, তা বিশ্লেষণ করলে, এবং সিপাহী বিদ্রোহের সময় বিনা দ্বিধায় বৃটিশ সৈন্যের বসবাসের জন্য সংস্কৃত কলেজ-ভবন ছেড়ে দিয়েছিলেন, সে কথা স্মরণ রাখলে এ-সিদ্ধান্তই করতে হয় যে, রামমোহন ও তাঁর পরবর্তীকালের বন্ধুদের মতো বিদ্যাসাগরও ইংরেজ শাসনকে বিধাতার আশীর্বাদ স্বরূপই মনে করতেন। ইংরেজ শাসন সম্পর্কে তিনি আলোচনা করেননি সম্ভবত এই কারণেই যে, নিঃশ্বাস বায়ুর মতোই তা সত্য ও অপরিহার্য।

বৃটিশ বুর্জোয়ার সাম্রাজ্যলিপ্সা ও বাণিজ্যিক স্বার্থ ভারতবর্ষের প্রাকৃতিক ও ভৌগোলিক চেহারা অভাবনীয়রূপে পরিবর্তিত করে চলছিল। রাস্তাঘাট নির্মাণ, রেলওয়ে স্থাপন এবং সুবিন্যস্ত ডাক-তার চলাচলের ব্যবস্থা প্রবর্তন করে ইংরেজ ভারতের আভ্যন্তরীণ বিধিব্যবস্থা ও জীবনে ঐক্য প্রতিষ্ঠা করছিল, যে ঐক্যের অভাবে আধুনিক কালে কোন বৃহত্তর রাজনৈতিক আন্দোলনই সাফল্যলাভ করতে পারে না। এই সব কর্মের সমান্তরাল ভাবেই চলছিল বিদ্যাসাগর মহাশয়ের শিক্ষা-বিস্তার ও নারীমুক্তি অর্জনের আন্দোলন। এদিক থেকে উভয়ের কর্ম-ক্ষেত্রই ভারতবর্ষ ও ভারতবর্ষের সমাজ। ইংরেজের পশ্চাতে সাম্রাজ্য-লিপ্সার অনুপ্রাণনা, আর বিদ্যাসাগরের কর্মের পশ্চাতে মানবিক ভাবধারায় বাংলা সমাজরূপান্তরের আত্যন্তিক গরজ। উদ্দেশ্যের বিভিন্নতা সত্ত্বেও কর্মের লক্ষ্যস্থল এক বলেই উভয়ের পক্ষে পরস্পরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করা সম্ভব হয়েছে; বিশেষতঃ, যে রাজনৈতিক দৃষ্টি ও ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিত থাকলে ইংরেজ বুর্জোয়ার সাম্রাজ্যলিপ্স কর্মের স্বরূপ উপলব্ধি করা সম্ভব, সমাজ-মানসে তার আবির্ভাব তখনও হয়নি। ফলে, ইংরেজ পরোক্ষে ভারতবর্ষের যে কল্যাণ সাধন করছিল, দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল তার উপর; প্রত্যক্ষভাবে যে অত্যাচার ও শোষণ নিয়ে

এসেছিল তার আবরণ ভেদ করা সম্ভব হয়নি। এই সামাজিক-রাষ্ট্রিক পরিবেশে বিদ্যাসাগরের মনোভাব তাই রামমোহনের মনোভাবেরই পুনরাবৃত্তি এবং ক্রমপরিণতি মাত্র। ইংরেজ সৃষ্টি করছিল বাইরের দিক থেকে, রামমোহনের মতো বিদ্যাসাগরও কালোপযোগী সমাজ-মানস সৃষ্টি এবং মানবিক সম্পর্কের গতি দ্বারা সমাজ-জীবনকে উদ্বুদ্ধ করার প্রচেষ্টা দ্বারা সৃষ্টি করছিলেন ভেতরের দিক থেকে।

কিন্তু, বিদ্যাসাগরের কর্ম ও বিদ্রোহ রামমোহন-শিষ্য এবং হিন্দু কলেজের অন্যান্য ছাত্রদের কর্ম ও বিদ্রোহ অপেক্ষা অধিকতর ব্যাপক ও সামাজিক গুরুত্বসম্পন্ন। হিন্দু কলেজের অধিকাংশ ছাত্রই ছিল ইংরেজ-সৃষ্ট এবং ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী-নির্ভর ভূম্যধিকারী ও বণিক পরিবারের সন্তান। ঐসব পরিবারের সামাজিক জীবন একান্তভাবেই বৃটিশ শাসন-ব্যবস্থার সঙ্গে জড়িত। তাছাড়া, তাদের চলনবলন, বাচনভঙ্গি, এমনকি অনেকাংশে পোষাক-পরিচ্ছদাদিও ইংরেজানুকরণে রচিত। তাই, দেশজ হয়েও তাঁরা যেন ছিলেন বিদেশাগত। দেশের মাটির সঙ্গে তাঁরা যেমন যোগসূত্রবিহীন, দেশীয় জনসাধারণের পক্ষেও তেমনি তাঁদের আত্মীয় বলে গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি। তাঁদের বিদ্রোহকে তাই ইংরেজী-নবীশদের বাচালতা বলে অবহেলা করা সহজ; এই বিদ্রোহও সমাজের অন্তরদেশে অনুপ্রবেশ করার সুযোগ পায়নি।

কিন্তু, ইংরেজসৃষ্ট সামাজিক আবর্তের ফসল হ'লেও বিদ্যাসাগর মহাশয়কে শ্বেতগন্ধী বলে তাঁর প্রতি অসম্মাননা ও তাঁর কর্মের সামাজিক গুরুত্বের প্রতি উদাসীন থাকা সম্ভব হলো না। ইংরেজের বাহ্য আচার আচরণের অনুকরণ বিদ্যাসাগর-জীবনে কোন দিক থেকেই অভিব্যক্ত হয়নি; রবীন্দ্রনাথের কথায়, তাঁর চটিজুতা চিরকালই ছিল তাঁর নিজেরই চটিজুতা। তাঁর পারিবারিক জীবনও কোম্পানী-নির্ভর ছিল

না। ফলে, তাঁর বোধ ও আচরণ হিন্দু কলেজের ছাত্রদের থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, ভিন্ন জাতের; তাঁদের কর্মের প্রকৃতিও ভিন্ন। হিন্দু কলেজের অধিকাংশ ছাত্র যেখানে ছিল বিদ্রোহের কলরবে মস্‌গুল ও বিত্তাবুদ্ধির সীমানায় আবদ্ধ, বিদ্যাসাগর সেখানে নীরব কর্মসাধনায় গ্রাম-গ্রামাঞ্চলে বিস্তৃতি লাভ করছিলেন, নবলব্ধ আলোকে জীবনকে উদ্দীপিত করার চেষ্টা করছিলেন; পানভোজনাদি ও আনুষঙ্গিক কলুষের আতিশয্যে তাঁদের অনেকে যেথানে নিঃশেষ অবলুপ্তির পথে অগ্রসর হয়ে চলছিলেন, বিদ্যাসাগর সেথানে অসামান্য চারিত্রিক দাঢ্য, পবিত্রতা, সুস্থ মানবিক বোধকে উজ্জীবিত রেখে এবং পানবিহারাদি নিবারণের আন্দোলন করে নির্মল সৃষ্টির পথ আলোকিত করে রেখেছিলেন। বাংলা তথা ভারতবর্ষ একদিন জ্ঞানে শিক্ষায় সমৃদ্ধিতে উদ্ভাসিত হবে, এবং জগৎসভায় সম্মানিত আসন লাভ করবে, বিদ্যাসাগরের মধ্যে যেন সেই সম্ভাবনারই নীরব প্রস্তুতি।

বিদ্যাসাগরের কর্ম, চিন্তাধারা ও ব্যক্তিগত আচরণে কোনরূপ চটক ছিল না বলে তাঁর কর্মের সামাজিক গুরুত্ব অনেকেরই দৃষ্টিগোচর হয়নি। সুদীর্ঘ কালের ব্যবধানের পর ইতিহাসের নির্মোহ পরিপ্রেক্ষিতে আজ আমরা তাঁকে চিনি,—তাঁরই মাধ্যমে অগণিত মানুষের জীবনের আকৃতি ও ইতিহাসের অন্তর-বেদনা অভিব্যক্তি লাভ করেছে। তিনি অগ্রচারী।

বিলাতে কেশবচন্দ্র

॥ ১ ॥

১৮৭০ সালের একেবারে শেষের দিকে ইংল্যাণ্ড থেকে স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের পর ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র 'সুলভ সমাচার' নামে এক পয়সা দামের একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করেন; এবং কিছু সংখ্যক নিরক্ষর শ্রমজীবীর শিক্ষাদীক্ষা ও মানসিক উন্নয়নের জন্য একটি নৈশ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। ঘটনাটি সামান্য। বিশেষতঃ, আমাদের বর্তমান বিদ্যাবুদ্ধি, রাজনৈতিক চেতনা ও বিচক্ষণতা, এবং দৃশ্যত সর্বগামী উদার মানসবৈশিষ্ট্যের বিচারে এই ঘটনা নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। কিন্তু, আমার বিশ্বাস, একটু চিন্তা করে দেখলেই, ব্রহ্মবাদী ধর্মযাজক ও সমাজ-সংস্কারকের এই কর্মের মধ্যে একটি বিশিষ্ট মানসভঙ্গীর অভিব্যক্তি লক্ষ্য করা যাবে; এবং তৎকালীন সাংস্কৃতিক পরিবেশে এর তাৎপর্যও নেহাৎ কম নয়।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদ অর্থাৎ রাজা রামমোহনের আমল থেকে ইংরেজ, ইংরেজ শাসন, পশ্চিমী শিক্ষাদীক্ষা ও জ্ঞানবিজ্ঞান সম্পর্কে প্রাগ্রসর ভারতীয়দের মধ্যে যে মনোভঙ্গী দেখা যায়, কেশবচন্দ্র উত্তরাধিকারসূত্রে এবং নিজস্ব শিক্ষাদীক্ষার মাধ্যমে সেই দৃষ্টিভঙ্গী লাভ করেন। তাঁর মানসজীবনও সেকালের কলেজী শিক্ষার বিচিত্র বর্ণসমারোহকে কেন্দ্র করে, এবং প্রথম দিককার ব্যবহারিক জীবন ইংরেজ-সংসর্গে কাটে। ইংরেজ শাসন, অন্যান্য সকলের মত তাঁর কাছেও, বিধাতার আশীর্বাদ; ইংরেজী শিক্ষা সত্যোপলব্ধির প্রধান

অবলম্বন। আবেগ-উৎফুল্ল কৃতজ্ঞতায় তিনি স্বয়ং বলছেন, করুণার বশবর্তী হয়ে ঈশ্বর ভারতবর্ষকে উদ্ধার করার জন্য বৃটিশজাতিকে প্রেরণ করেন ; ঈশ্বরেরই আজ্ঞাবহরূপে ইংল্যাণ্ড এলো, এবং ভারতের তিমির-অবগুণ্ঠিত দরজায় করাঘাত করে বললো, ওঠো এবার, দীর্ঘকাল সুপ্ত ছিলে তুমি ("Noble sister, rise! thou hast slept too long")। জাগ্রত হলো ভারত। দিকে দিকে, হিমালয় গিরিশ্রেণী থেকে কেপ্ কমোরিন পর্যন্ত, নবজীবনের ধারা প্রবাহিত হতে থাকলো। নতুন আশায়, নতুন উদ্দীপনায়, সুউচ্চ বোধ ও আদর্শ সম্মুখে রেখে একটা নতুন জাতি জাগ্রত হয়ে উঠেছে। ইংরেজী জ্ঞানবিজ্ঞানই এই জাতির চোখের মণি। তাই, শেক্সপীয়র, মিলটন এবং নিউটন শুধু ইংল্যাণ্ডের নয়, ভারতবর্ষেরও। ইংল্যাণ্ডের সব কিছু বোধবুদ্ধি ভাবনাকল্পনার মধ্যে এই ভারত তার অন্তরের মিল খুঁজে পায়,—ইংল্যাণ্ডের বিজ্ঞান ও দর্শন ভারতেরও। সুতরাং চিন্তায় ও বোধবুদ্ধিতে তারা একাত্ম, অভিন্ন-হৃদয়। ইংল্যাণ্ডের আলোকস্পর্শে তার অজ্ঞানতা ও কুসংস্কারের কুয়াশা ধীরে ধীরে কেটে যাচ্ছে। ব্যবহারিক, সামাজিক ও চিন্তা-জীবনের বিস্তৃত পরিসরে ইংরেজ ইতিমধ্যেই যে রূপান্তর সাধন করেছে, তা-ই তার সুশাসনের চিরস্থায়ী স্মৃতিসৌধ। তার চেয়েও তার বড়ো অবদান নৈতিক ও ধর্মীয় পুনর্জাগরণের ক্ষেত্রে। সেজন্যই, বর্তমান ভারত বাইবেলের মর্মবাণী গ্রহণ না করে বাঁচতে পারে না। (১)

এবং পারে না বলেই কেশবচন্দ্রের বিলাত আগমন। জীবনযাত্রা ও প্রবাহের সমস্ত দিক থেকে সৃষ্টিশীল খৃষ্টধর্মকে উপলব্ধি করার জন্যই তিনি ইংল্যাণ্ড গিয়েছিলেন। খ্রীষ্টধর্মের তত্ত্বগত

---

(১) Lectures in England, pp. 89-93.

ও নীতিগত আলোচনা বা সূত্র অনুধাবন করার জন্য নয়, খ্রীষ্টান বিশ্বপ্রেম, খ্রীষ্টান দয়াদাক্ষিণ্য এবং খ্রীষ্টান আত্মত্যাগের মূল প্রেরণা ও উৎস কোথায় তা আবিষ্কার ও উপলব্ধির জন্যই ছিল তাঁর একান্ত আগ্রহ। এবং দরিদ্র জনসাধারণের শিক্ষাদীক্ষা, বৈষয়িক ও আত্মিক উন্নয়ন ও সংস্কারের যে সব জীবন্ত স্বাক্ষর তিনি দেখেছেন ইংল্যাণ্ডের সহরে সহরে, তাতে অত্যন্ত বিস্মিত হয়েছেন তিনি; ইংরেজের পারিবারিক জীবনে যে পবিত্রতা, সুরুচি এবং মাধুর্যের পরিচয় পেয়েছেন তিনি, তাও তাঁকে বিশেষ ভাবে মুগ্ধ করেছে। ইচ্ছে ছিল তাঁর, সাধারণভাবে ভারতবর্ষের জাতীয় রাষ্ট্রীয় জীবনে, এবং বিশেষভাবে ব্যক্তিগত পারিবারিক জীবনে খ্রীষ্টান-সুলভ মানবিকতা, করুণা ও পবিত্রতা আমদানী করে ভারতবর্ষের জাগরণের পথকে সহজতর ও সুন্দরতর করা। যে দুটো ঘটনার উল্লেখ করে বর্তমান প্রবন্ধের সূত্রপাত করেছি, বলা বাহুল্য, সেগুলি কেশবচন্দ্রের এই আকাঙ্ক্ষারই বাস্তব অভিব্যক্তি। এই সব কর্মে ইংরেজের সহায়তা প্রত্যাশা করেছিলেন তিনি। খ্রীষ্টান ইংরেজ নিজের দেশে ও সমাজে যে দয়াদাক্ষিণ্য, করুণা ও মানবিকতার পরিচয় দেয়, ভারতবর্ষেও তাই দিক, এই ছিল তাঁর প্রার্থনা। (২)

রাজা রামমোহনের মতো কেশবচন্দ্রের চোখও ইংরেজের উপরই নিবদ্ধ ছিল। ইংরেজের ন্যায়শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করে তার সার্বভৌমত্বের উপর গভীর শ্রদ্ধা ও অনুরাগ ছিল রাজা রামমোহনের; এবং ঐসব সার্বভৌম অধিকারাদি ভারত-বাসীদের জন্য অর্জন করাই ছিল রাজার একমাত্র কাম্য। বলাবাহুল্য, রামমোহনের বুদ্ধিবাদী মনন, কালজয়ী দূরদৃষ্টি ও রাজনৈতিক প্রতিভার

(২) ঐ, পৃঃ ৪৮৫

অধিকারী ছিলেন না কেশবচন্দ্র, তাঁর জীবনসাধনা ছিল ভিন্নতর প্রকৃতির এবং কর্মক্ষেত্র স্বতন্ত্র। কিন্তু, তা সত্বেও, ইঙ্গ-ভারতীয় সম্পর্কের ঐক্য ও সম্প্রাতি, পারস্পরিক নির্ভরশীলতা ও সংযোগ, স্বার্থ ও উদ্দেশ্যের সমতা, ইত্যাদি সমস্যা তাঁর মনের পুরোভাগেই ছিল; এবং আদর্শ ও সাধনা বিভিন্ন হলেও তিনিও ইংল্যাণ্ড ও ভারতের সম্মিলিত বিকাশধারার চিত্রই আঁকতেন নিজ মানসপটে। যৌথ সমৃদ্ধির আলোকে মন উদ্ভাসিত হতো তাঁর।

কেশবচন্দ্র ছিলেন পুরাদস্তুর অধ্যাত্মবাদী। ব্রহ্মোপলব্ধি ছিল তাঁর জীবনের একমাত্র এবং চিরন্তন লক্ষ্য; তাঁর মতে, ব্যক্তি হিসেবে প্রত্যেক মানুষেরই জীবনসাধনা হওয়া উচিত তাই। আর এই সাধনায় সিদ্ধিলাভের পথ হলো প্রেমের পথ; ঈশ্বরের প্রতি প্রেম এবং মানুষের প্রতি প্রেম। ঈশ্বরে-মানুষে এই প্রেমের উপলব্ধিই জীবনসাধনায় সিদ্ধিলাভ। এই ভাবধারা অবলম্বন এবং যিশু খৃষ্টকে অনুসরণ করে তিনি "Fatherhood of God and the Brotherhood of Man"-তত্ত্বে অটল বিশ্বাসী হয়ে পড়েন। প্রত্যেকটি মানুষের স্রষ্টিকর্তা পিতা যখন এক অথবা সমস্ত মানুষই যখন একই জগৎপিতার সন্তান, তখন তাদের প্রত্যেকের পার্থিব জীবন, প্রত্যেকটি দেশ প্রতিটি জাতির জীবনও একই অধ্যাত্মসূত্রে আবদ্ধ। ঐ সূত্রকে যথাযথ ধরতে পারলে এই পৃথিবীতেই পূর্বোক্ত অধ্যাত্ম তত্ত্বের সার্থক রূপায়ণ সম্ভব। কেশবচন্দ্র এই স্থির বিশ্বাসেই ইংল্যাণ্ডকে তাঁর জগৎপিতার পশ্চিমের (Western) আবাস-স্থল এবং ভারতবর্ষকে জগৎপিতার পূবের (Eastern) আবাসস্থল বলে আখ্যাত করেছেন। সেই জগৎপিতারই ইচ্ছা যে, পশ্চিম এবার পূবের দ্বার আলোকিত করুক। তিনি আশা করছেন, প্রত্যেক ইংরেজই একথা উপলব্ধি করবে যে, ভারতে ইংরেজ শুধু অছি মাত্র, এবং ঈশ্বরই কোটি

কোটি মানুষের জীবনের দায়িত্ব তাদের হাতে তুলে দিয়েছেন ('the destiny of so many millions of human beings constitutes a stupendous trust reposed by God Himself in the hands of the British nation')। (৩) তাঁর আরও আশা যে, শাসক-ইংরেজের মনে এই ভাবধারার, এবং শাসিত ভারতীয়দের মনে ইংরেজ ঈশ্বরপ্রেরিত বন্ধু এই ভাবধারার উন্মেষ হলেই পরস্পর ভুল বোঝাবুঝির পর্ব শেষ হবে, এবং বন্ধুতার রাখীবন্ধন করে ইংল্যাণ্ড ও ভারত ভবিষ্যতের পথে অগ্রসর হবে। ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা সম্পর্কে কেশবচন্দ্রের বিশ্বাস সুগভীর, এবং ভবিষ্যৎকে সৃষ্টি করার সুমহান কর্মেই তিনি সহৃদয়তা প্রার্থনা করছেন ইংরেজের।

॥ ২ ॥

কেশবচন্দ্রের ব্যক্তিগত জীবনসাধনার প্রকৃতি যাই হোক না কেন ঐ প্রার্থনার দিক থেকে রামমোহনের মানসভঙ্গী ও কেশবচন্দ্রের মানসভঙ্গীর মধ্যে কোন পার্থক্য বা বিরোধ নেই। রামমোহনের কাল স্বাভাবিক গতিধারার নিয়মেই কেশবচন্দ্রের কালে পরিণত হয়েছে। তখনও ইংরেজের সৃষ্টিশীল কর্ম-প্রেরণার প্রতি বিশ্বাস, তাঁদের কর্মের সঙ্গে সংযুক্ত থাকার, এবং রূপান্তরধর্মী কর্মে ইংরেজের সাহায্য লাভের আকাঙ্ক্ষা সমান বর্তমান।

কিন্তু, তা সত্ত্বেও, হাওয়ায় যেন অন্য কী সুর।

কেশবচন্দ্র ইংল্যাণ্ড যাত্রার পূর্বেই শিক্ষাগর্বী মধ্যবিত্ত জীবনে

---

(৩) The Path of Universal Fellowship, Lectures in England ; Page 163

অনেক কয়েকটা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা সংঘটিত হয়। সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার ব্যাপারে শাসকগোষ্ঠীর সঙ্গে তাদের মনোমালিন্য আত্মপ্রকাশ করে এবং শাসনব্যবস্থায় তারা অধিকতর কর্তৃত্ব দাবী করতে সুরু করেন ; মাতৃভাষার প্রতি অকস্মাৎ তাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়ে যায়, এবং ইংরেজীতে সাহিত্য সৃষ্টির সুখস্বপ্ন পরিত্যাগ করে বাঙ্গালী লেখক 'অর্দ্ধশিক্ষিতের ভাষা' বাংলায় কাব্য উপন্যাস ইত্যাদি রচনা আরম্ভ করেন ; প্যারীচরণ সরকার, বিদ্যাসাগর প্রভৃতির চেষ্টায় মদ্যপান নিবারণী আন্দোলন দানা বেঁধে ওঠে ; সর্বোপরি নবগোপাল মিত্র প্রভৃতির অসামান্য উৎসাহ উদ্দীপনায় জাতীয় মেলা, পারস্পরিক ঐক্যবোধ এবং কিছুটা জাতীয় আত্মম্ভরিতার উদ্বোধন হয় ধীরে ধীরে। অর্থাৎ, ইতিপূর্বে ইংরেজের শুভবুদ্ধি ও সদিচ্ছার উপর যতোটা বিশ্বাস স্থাপন করা সম্ভব হয়েছিল, বর্তমানে ততোটা আর সম্ভব হচ্ছে না ; বরং, আত্মশক্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়ে ইংরেজ-নির্ভরশীলতা কমিয়ে বেঁচে থাকা এবং পরিপূর্ণ মর্যাদায় ও সমৃদ্ধিতে প্রতিষ্ঠিত হওয়া সম্ভব কিনা, তারই পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে। ইংরেজের পিতৃস্নেহ থেকে বঞ্চিত হয়ে অভিমানে ইংরেজকে পাল্টা এ কথাটা বলার প্রয়োজন অনুভূত হয়েছে যে, ভারতবাসী বা বাঙ্গালীরা কম কিসে !

এই সব ঘটনার সামাজিক ও রাষ্ট্রিক গুরুত্ব এতোটা বেশি যে, তার প্রভাবে প্রচলিত ইঙ্গ-ভারতীয় সম্পর্ক চঞ্চল এবং কিছুটা বা বানচাল না হয়ে পারে না। কেশবচন্দ্র অবশ্য প্রত্যক্ষভাবে এইসব কর্মের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন না, কিন্তু কর্মের কর্তাদের সহিত যোগাযোগ বা সাথীত্ব ছিল। আর, চারদিকের হাওয়ায়-ছড়ানো এই উদ্বোধনের বার্তা সে-আমলের সমস্ত সংবেদনশীল চিত্তকে নিশ্চিতরূপেই স্পর্শ করে থাকবে।

কেশবচন্দ্রকেও আমরা বিলাতে বৈঠকের পর বৈঠকে নিঃশঙ্কচিত্তে

একথা ঘোষণা করতে দেখি, ভারতবর্ষকে নিয়ে যা-খুসী করার দিন বহুকাল হয় গত হয়ে গেছে ; ইংরেজরা যেন সর্বদা মনে রাখে যে ভারতবাসীর প্রতি যে অবিচার, অন্যায়াচরণ ও অত্যাচার করা হবে, তার নিদারুণ প্রতিফল ইংল্যাণ্ডকেও ভোগ করতে হ'বে।...ভারতকে কি ইংল্যাণ্ড এমন কিছু দেয়নি যার জন্যে তার নিজেরই লজ্জিত হওয়া উচিত ?...ভারত শাসনব্যবস্থায় গুরুতর গলদ ও কুৎসিত গ্লানি জড়িত রয়েছে, ভারতের ন্যায্য দাবী উপেক্ষিত হচ্ছে, এবং ভারতীয়দের উপর অমানুষিক অত্যাচার উৎপীড়ন চলেছে ; এ সবকিছুর জন্যেই ইংল্যাণ্ড দায়ী (For these you are responsible)। এবং তিনি আশা করছেন, ভারতবর্ষ যা চায় এবং যা চাওয়ার তার 'অধিকার' রয়েছে (which she has a right to demand from you), তা থেকে ইংল্যাণ্ড তাকে বঞ্চিত করবে না।

নিঃসন্দেহ যে, ইংরেজ-আশ্রিত এবং বৃটিশ শাসনব্যবস্থাপুষ্ট বুদ্ধিজীবীদের কণ্ঠ থেকে রাজকার্যের সমালোচনা ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ইতিপূর্বেও ধ্বনিত হয়েছে ; কিন্তু, তৎকালে, বৃটিশ আশ্রয়ের নিরাপত্তা সম্পর্কে সন্দেহ দেখা দেয়নি। এখন, সমালোচনা ও প্রতিবাদের সুর যেমন চড়া, দাবীর বহরবাহারও তেমনি বিস্তৃত ; তাছাড়া, আছে একটা অভিনব মনোভঙ্গীর প্রলেপ।

কেশবচন্দ্র বলছেন, একথা বলার অধিকার ইংরেজদের নেই যে, ভারতবর্ষের সমস্ত সম্পদ, ধন-দৌলত, প্রাকৃতিক উপকরণ ইত্যাদি কেবলমাত্র ইংল্যাণ্ডের স্বার্থসমৃদ্ধি বা ব্যবহারের জন্যই ব্যয়িত হ'বে। ভারতের কোটি কোটি আত্মার জন্য ইংল্যাণ্ডকে ঈশ্বরের নিকট জবাবদিহি করতেই হ'বে। শুধুমাত্র মানচেষ্টার বা ভারতপ্রবাসী বৃটিশবণিক বা অন্য কোন স্বার্থবাহী গোষ্ঠীর হিতের জন্য ভারতবর্ষ নিজেদের দখলে

রাখার কোন অধিকার ইংল্যাণ্ডের নেই। (You cannot hold India for the interest of Manchester, nor for the welfare of any other section of the communit here, not for the advantage of those merchants who go there and live as birds of passage for a time, and never feel an abiding interest in the country, because they really cannot do so.) একমাত্র ভারতবর্ষের উন্নতি ও কল্যাণের জন্যই ইংল্যাণ্ড ভারত শাসন করতে পারে।(৪) তা যদি না হয়, তাহলে ভারত ইংল্যাণ্ডের হাত-ছাড়া হয়ে যাবে ; ইংল্যাণ্ড ভারত ত্যাগ করতে বাধ্য হবে, এবং নিজস্ব ধ্যানধারণা অনুযায়ী ভারতীয়রা স্বদেশ শাসন করবে। (if not, India will no longer be in your hands. You will be forced to leave India to herself and we shall do our business in the best way we can.)

কেশবচন্দ্র ইংল্যাণ্ড গিয়েছিলেন খৃষ্টীয় জীবনযাত্রা ইত্যাদির ব্যবহারিক রূপ অনুধাবন করার জন্য। প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক মতবাদ বা দাবীদাওয়ার প্রতি সংযোগ ছিল না তাঁর। তথাপি তাঁর কণ্ঠকে আশ্রয় করে তৎকালীন ইঙ্গ-ভারতীয় সম্পর্কের বিচলিত-হওয়া রূপটী আত্মপ্রকাশ করেছে। যে মধ্যবিত্তভোগী শিক্ষিতের সৃষ্টি হয়েছিল বৃটেনের সাম্রাজ্যিক স্বার্থের প্রয়োজনে, যারা মনে করতেন শেক্সপীয়র-মিলটন-নিউটন শুধু ইংল্যাণ্ডের নয় ভারতেরও, এবং যারা প্রত্যক্ষ-ভাবেই ছিলেন ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার বাহন, তাদের মুখ থেকে

(৪) England's Duties to India, Lectures in England ; Pp. 199-200.

এই হুঙ্কার বিস্ময়ের উদ্রেক করলেও তা সত্য। মধ্যবিত্তের বাচনভঙ্গীতে এই উগ্রতা কিছুকাল আগে থেকেই লক্ষ্য করা যায়। এই রক্তচক্ষু শাসানিরই অপর পৃষ্ঠায় দেখতে পাই আত্মধিক্কারের চেতনা এবং ধিক্কার-জনিত ক্ষোভ। ক্ষোভে উদ্বেলিত হয়ে কেশবচন্দ্র বলছেন, ইংরেজ আমাদের শেক্সপীয়র-মিলটন উপহার দিয়েছে সত্য, কিন্তু তারা কি আমাদের বিয়ার-ব্র্যাণ্ডিও উপহার দেয়নি? ইংরেজ অনুসৃত আফিং-এর ব্যবসায় হাজার হাজার চীনা মৃত্যুর পথে অগ্রসর হয়ে চলেছে, আর অগণিত ভারতবাসী মদের নেশায় কলুষ ও গ্লানির অতল গহ্বরে নিমজ্জিত। শুধুমাত্র অতিরিক্ত রাজস্বের লোভেই কি ইংরেজ এই ঘৃণ্য ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে না? (৫) যারা শেক্সপীয়র মিলটনের জাত, তাদের পক্ষে এর চেয়ে ঘৃণ্য আর কি হতে পারে? কেশবচন্দ্র বলছেন, এইভাবে অর্থাৎ হাজার হাজার মানুষের মৃত্যু, দুর্দশা আর নৈতিক বিপর্যয়ের বিনিময়ে যদি রাজকোষে রাজস্ব সঞ্চয় করতে হয় তাহ'লে ওরকম রাজস্ব না-থাকাই ভাল।

তাঁর অন্তরের সমস্ত মানবিকতা, দরদ ও দেশপ্রেম এই কলুষের প্রতিবাদে মুখর হয়ে উঠেছে। এর মধ্যে তিনি দেখতে পাচ্ছেন, অপরিমিত শক্তির অপচয়, জাতীয় সমৃদ্ধির অপমৃত্যু। অথচ, শিক্ষিত 'ইয়ং বেঙ্গল' একদিন এই মদ্যপানকেই না প্রচলিত হিন্দুধর্মের সমস্ত সংস্কার ও মোহ থেকে মুক্তিলাভের প্রধান অবলম্বন রূপে গ্রহণ করেছিল। সেই মুক্তিদাতাই এখন হত্যাকর্তা রূপে আবির্ভূত হয়েছে। এবং তার কদর্য রূপটায় আতঙ্কিত হ'য়ে কল্যাণকামী নতুন ইয়ং বেঙ্গল আত্মরক্ষার চিন্তায় ব্যাকুল হয়ে উঠেছে।

---

(৫) Lectures in England; Pp. 182-84.

দৃষ্টিভঙ্গীর রূপান্তর হয়ে চলেছে ধীরে ধীরে। কাল এমনিভাবেই গোপনে তার নিজস্ব কাজ করে যায়।

॥ ৩ ॥

অর্থাৎ ভারত-ইতিহাসের ডায়লেকটিক্ গতির খেলা স্থির নির্দিষ্ট লক্ষ্যের পানে সঙ্গোপনে ভারতকে টেনে নিয়ে চলেছে। সাম্রাজ্যিক স্বার্থের গরজে ইংরেজ ভারতে যে দেশী মাধ্যম ও শিক্ষাগর্বী মধ্যবিত্ত শ্রেণী সৃষ্টি করেছিল, ইংরেজের আশা ছিল যে তারা বরাবর ইংরেজ-নির্দিষ্ট পথে ইংরেজ-সীমিত আদর্শ সম্মুখে রেখে জীবন যাপন করবে। সে-আমলের ইয়ং বেঙ্গল সেই সীমারেখায় বিচরণ করতে প্রস্তুতও ছিল। তাই বিনা দ্বিধায় তারা ঘোষণা করতে পারতেন, যা কিছু ইংরেজসম্মত তাই সর্বশ্রেষ্ঠ; ভারতীয় শাস্ত্রাদিতে যা স্বীকৃত তা নিতান্তই অনাচরণীয়। কিন্তু, মানুষ তা চাইলেও কাল তা চায়নি। সেজন্যই কালের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে দেখতে পাই আমরা, ইংরেজ-স্বীকৃত এবং ইংরেজী শিক্ষালব্ধ যুক্তিবাদকে আশ্রয় করে ইংরেজের দেশী মাধ্যম তাদের সীমাকে লঙ্ঘন করছেন; যেখানে তাদের উচ্ছিষ্টাংশ নিয়ে সন্তুষ্ট থাকার কথা, সেখানে তারা দাবী করছেন রাজকার্যের বড় রকমের অংশ; যেখানে সাম্রাজ্যিক স্বার্থের বাহন হয়ে তাদের বিরাজ করার কথা, সেখানে আত্মপ্রকাশ করছে ভারতবর্ষের সুখসমৃদ্ধির চেতনা; যেখানে সাংস্কৃতিক বোধবুদ্ধি মননের দিক থেকে মনেপ্রাণে ইংরেজ হওয়ার কথা, সেখানে তারা বলছেন জাতীয় ভাষা, জাতীয় পোষাক-আসাক, জাতীয় মনোভঙ্গীর কথা! অবশ্য, সাম্রাজ্যিক কাঠামোর সঙ্গে তাদের সম্পর্ক ছিন্ন হয়নি তখনও, কিন্তু পরিবর্তনটা অনায়াসলক্ষ্য।

বলছেন কেশবচন্দ্র, একথা ভেবে যেন আমরা কখনও আত্মহারা না

হই যে যা-কিছু ভারতীয় তা-সবই কুৎসিত, আত্মবিধ্বংসী ; আর যা-কিছু ইংরেজকৃত তা-সবই চমৎকার, সুস্থ-সজীব ও প্রাণদায়ী। কক্ষনো নয়। বৃটিশ সমাজব্যবস্থায়ও প্রচুর গ্লানি, প্রচুর দুর্নীতি বর্তমান। তিনি একথা বলেও ইংরেজ ও স্কচ্‌ম্যানদের সতর্ক করে দিয়েছেন যে, কিভাবে খানা-পিনা করতে হয়, কিভাবে পোষাক-পরিচ্ছদ পরতে হয়, চলনবলনের নিয়ম কি, এসব যেন তারা ভারতীয়দের শেখাতে না যান ; যেন জোর জবরদস্তি করে ভারতের বুকে বিজাতীয় রীতিনীতি, সমাজধর্ম ও আচারআচরণ চাপাতে না যান। কারণ, তাঁর মতে, প্রত্যেক জাতিরই উচিত চিরকাল নিজবৈশিষ্ট্যে প্রতিষ্ঠিত থাকা। স্কটল্যাণ্ড যদি স্কচ্‌ম্যানদের নিকট প্রিয় হয়ে থাকে, তাহলে তাঁর চিত্তে ভারতবর্ষও সমান উজ্জ্বল, সমান প্রিয়। খৃষ্টীয় ধর্মে যা মহনীয় খৃষ্টান সমাজজীবনে যা মধুর ও অনুকরণীয়, তা গ্রহণে তিনি কুণ্ঠিত নন, কিন্তু—। কিন্তু নিজস্ব জাতিগত বৈশিষ্ট্য বিসর্জন দিতে তিনি কোনমতেই প্রস্তুত নন। ইংরেজী শিক্ষার রূপান্তরধর্মী বাণী প্রাণ ঢেলে দিক ভারতের শীর্ণধারা জাতীয় জীবনে, কিন্তু, ভারতবর্ষ বিকাশলাভ করুক নিজস্ব জাতীয় ভঙ্গীতে। ("I, for one, would not allow myself to be denationalised. Bring the influence of English education to bear upon the work of Indian reformation, but I would ask you to let the spirit of Indian nationality develop all that was good therein in a national way.") ইংল্যাণ্ড থেকে বিদায় নেওয়ার প্রাক্কালে তিনি তাঁর অগণিত বৃটিশ গুণগ্রাহীকে পুনরায় স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে, তিনি এসেছিলেন ভারতবাসীরূপে, ফিরেও যাচ্ছেন ভারতবাসীরূপেই। ইংল্যাণ্ড তাঁকে আরও বেশি ভারত-ধর্মী করে দিয়েছে ; তিনি তাঁর দেশকে আগের চাইতে ঢের বেশি ভালবাসতে

শিখেছেন। (৬) এর সঙ্গে আরও একটা কথা সম্ভবত উহ্য থেকে গিয়েছে, নতুন ভারতবর্ষের মুখ পুনরায় নবতর অর্থে পূর্বমুখী হতে চলেছে।

কেশবচন্দ্র যদিও 'Fatherhood of God and Brotherhood of Man'-তত্ত্বে গভীর বিশ্বাসী ছিলেন, এবং যদিও অধ্যাত্মসাধনার ক্ষেত্রে প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের সংশ্লেষসাধনই ছিল তাঁর একমাত্র কাম্য, তথাপি তাঁর ধর্মীয় চিন্তায়ও পূর্বোক্ত মনোভঙ্গীর স্বাক্ষর মেলে। বিলেতে তাঁর প্রথম সম্বর্ধনা সভায় তিনি বলছেন, খৃষ্টধর্মের প্রবর্তক, তার আদি রূপ ও ঐতিহ্য ইত্যাদি নিঃসন্দেহে ছিল এশীয়, প্রাচ্য। তা যদি হয়ে থাকে তাহলে আধুনিক কালে ঐ ধর্মকে কেন পাশ্চাত্যের প্রলেপ দিয়ে ভারতীয়দের মধ্যে প্রচারকরা হবে? বরং, তিনি বলছেন, এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা বন্ধ থাক, ভারতীয়রা নিজেরাই বাইবেল অধ্যয়ন করতে পারবে।

ধর্মীয় বিশ্বাসে এমনি ধরণের একটা বিশিষ্ট অন্যনিরপেক্ষ স্বাধীন ও জাতীয় মনোভঙ্গী বিলাত যাবার পূর্বেই তাঁর মধ্যে আত্মপ্রকাশ করেছিল। সমাজ পরিসরের উন্মেষিত-হতে-থাকা জাতীয় ভাবধারা এক্ষেত্রে কেশবচন্দ্রকে বিশেষ ভাবেই উদ্বুদ্ধ করে থাকবে, তাঁকে ঐরূপ ভাবনায় ভাবিত করে তুলে থাকবে। মন যে কত বেশি কালের প্রহরাধীন এ থেকেও তা প্রমাণিত হবে। কেশবচন্দ্র বলছেন, ভারতের ভবিষ্যৎ ধর্ম ও ধর্মসমাজ হবে সম্পূর্ণ জাতীয়। সমগ্র মানবগোষ্ঠীর ধর্ম-জীবনের যে চিত্র তিনি আঁকছেন তাতে দেখা যাচ্ছে, পৃথিবীর সমস্ত জাতিই একই ধর্মবিশ্বাসের আশ্রয়ী হবে; কিন্তু প্রত্যেকটি বিশিষ্ট জাতীয় পরিবেশে ঐ ধর্ম একটা নির্দিষ্ট স্বতন্ত্র দেশজ রূপ পরিগ্রহ করবে। ভারতবর্ষের

---

(৬) Lectures in England, Pp. 265, 412-13, 493 etc.

নিজস্ব বিবিধ ধর্মীয় আচারআচরণ, ঐতিহ্য, রুচি, সংস্কার ইত্যাদি রয়েছে। তা-সবই তার নিকট পবিত্র ও প্রিয়। এই সব প্রিয় সম্পদ ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করবে, এটা আশা করা বৃথা। ভারত কথনও তা বিসর্জন দিতে পারবে না; কারণ, এ তার জীবনের সঙ্গে গ্রথিত। তিনি আরও বলছেন, উপর থেকে কোন ধর্মমত বা সমাজ যাতে এদেশের ওপর চাপানো না হয় সেদিকে দৃষ্টি রাখতে হবে; সেই ধর্মমতই ভারতের কাম্য যা তার ঐকান্তিক অধ্যাত্ম গরজে ও স্বাভাবিকভাবে গড়ে উঠবে। বিদেশী ফুলের চারার মত তা আমদানী করলে চলবে না; ভারতের জাতীয় আত্মার গভীরে তার মূল উৎসকেন্দ্র থাকা চাই। আবেগ-উচ্ছ্বসিত ভাষায় তিনি বলেছেন, 'We shall see that the future Church is not thrust upon us, but that we independently and naturally grow into it; that it does not come to us as a foreign plant, but strikes its deep in the national heart of India, draws its sap from our national resources, and develops itself with all the freshness and vigour of indigenous growth.' এমনিভাবে ভারত ভারতীয় কণ্ঠে পরম কারুণিক জগৎপিতার মহিমা কীর্তন করবে। (৭)

ইংল্যাণ্ড প্রবাসকালে কেশবচন্দ্র ইংরেজের স্বদেশপ্রেম সম্পর্কে যে অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন, তা তাঁর উপরে-বিশ্লেষিত মনোভাবকে অধিকতর পুষ্ট করেছে।

॥ ৪ ॥

এমনিভাবে রামমোহনের কাল থেকে যাত্রা সুরু করে বিদ্যাসাগরের

---

(৭) Future Church, 1869 Lecture.

আমলের ভেতর দিয়ে কেশবচন্দ্রের কালে এসে পৌঁছে আমরা নতুন এক ভাবাকাশের সন্ধান পাই। এ আমলে বাংলা তথা ভারতবর্ষের রাষ্ট্রিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের পুরোভাগে আমরা যাঁদের পাই, তাঁরাও ইংরেজ-সৃষ্ট সামাজিক আবর্তের ফসল; পূর্বগামীদের মত তাঁদেরও ব্যবহারিক ও মানসজীবন অধিকাংশ ক্ষেত্রে ইংরেজকে কেন্দ্র করেই বিবর্তিত। তথাপি, পুরাতন ইয়ং বেঙ্গল ও আধুনিক ইয়ং বেঙ্গল এক নয়; নতুনের কণ্ঠে নতুন বাণী এবং নতুন সুর সংযোজিত হয়েছে। কারণ, তাঁরা ১৮৬০ সালের পর থেকে ক্রমাগত ক্ষুণ্ণ-হতে-থাকা ইঙ্গ-ভারতীয় সম্পর্কের বিক্ষোভ এবং বিক্ষোভ-জাত জাতীয় ভাবধারাকে আত্মস্থ করেছেন। তাঁদের মানসপরিমণ্ডল অন্তঃশীল রূপান্তরের চাঞ্চল্যে একটু একটু দোল খেতে আরম্ভ করেছে।

পূর্বেই উল্লেখ করেছি, কেশবচন্দ্রের জীবনসাধনার লক্ষ্য ও প্রকৃতি ছিল ভিন্নরূপ। এবং জীবন তাঁর মুখ্যত সেই সাধনায়ই ব্যয়িত হয়েছে। কিন্তু, তা সত্বেও, বিলাতে যে কেশবচন্দ্রকে আমরা পাই—আর শুধু বিলাতেই বা কেন, ইংল্যাণ্ড যাত্রার পূর্বাহ্নে এবং প্রত্যাবর্তনের পর কয়েক বছর অন্তত, যে কেশবচন্দ্রকে আমরা পাই—তাঁর মধ্যে ঐ ভাবধারা পূর্ণমাত্রায় ক্রিয়াশীল। তাঁর ধর্ম-ব্যাখ্যানের মধ্য দিয়ে সে কালের ভারতীয় যুবক তাই অধ্যাত্ম জীবনের অনুপ্রেরণা ছাড়াও আর একটা বস্তুর সন্ধান পেয়েছিল। সেটা স্বদেশধর্ম। তাঁর ভক্তিরস-ঢালা ঈশ্বরপ্রেম উদ্বুদ্ধ করেছিল অগণিত মানুষ ও কর্মীকে; ধর্মচিন্তার সঙ্গে সঙ্গে তারা পেয়েছিল জাতীয়ভাবে জেগে-ওঠার প্রেরণা। তাঁর ভারত পরিভ্রমণের বক্তৃতামালায় তিনি তাঁর দেশবাসীকে বারবার স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে 'স্বর্গের' আলোকে ভারতে নতুন ঊষার আবির্ভাব হয়েছে; সেই আলোক ক্রমে ক্রমে যাতে মধ্যাহ্ন-সূর্যের কিরণে পরিণত হয়, তার

জন্যেই সকলকে নব নব কর্মে আত্মনিয়োগ করতে হবে, নতুন শক্তিতে বলীয়ান হতে হবে।

এই স্বর্গের আলোক আর কিছু নয়, জাতীয়তাবাদের আলোক ; এই শক্তি আর কিছু নয়, জাতীয় ভাবধারার শক্তি। কেশবচন্দ্র 'সুলভ সমাচার' এবং নৈশ বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন ; তার মাধ্যমে বিলাত থেকে-পাওয়া খৃষ্টানসুলভ দয়াদাক্ষিণ্য ও হৃদয়বৃত্তির অভিব্যক্তি রয়েছে সত্য, কিন্তু তার চেয়েও বড সত্য সম্ভবত এই যে, তাতে দেশ ও দেশের জনসাধারণ কিঞ্চিৎ স্বীকৃতিলাভ করেছে, এবং তাদের উন্নয়নের চেষ্টাও এখানে বর্তমান। এই আমলের মধ্যবিত্ত রাজনীতির এও একটা বৈশিষ্ট্য যে, পূর্বে যাঁরা ছিলেন আত্মসমাহিত, তাঁরা এই সময় থেকেই দেশবাসীকে নিজেদের দুঃখ ও ব্যর্থতার কথা, দেশের দুরবস্থার কথা শোনানোর প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে জনগণকে টেনে আনার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন।

রাষ্ট্রীয়-সামাজিক জীবনে জনগণের আবির্ভাবের কাল থেকেই ভারতে প্রকৃত জাতীয় জীবনের সূত্রপাত।

স্বামী বিবেকানন্দের ভারতবর্ষ

১৮৮০ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে সর্বপ্রথম রামকৃষ্ণ-নরেন্দ্রনাথ সাক্ষাৎকার অনুষ্ঠিত হয়।

কলকাতা তখন নানাবিধ সামাজিক, রাষ্ট্রিক ও ধর্মীয় ঘাতসংঘাতে বিক্ষুব্ধ। নব ভারতের নতুন সংস্কৃতির নির্মাতাগণ ইংরেজের প্রতি যে অচল বিশ্বাসে জীবনের প্রবাহপথে যাত্রা করেছিলেন, সে বিশ্বাসের ভিত্তিমূল শিথিল হয়ে গেছে। ইংরেজের কোন কর্মের মধ্যেই আর তাঁরা সৃষ্টির, জেগে-ওঠার আহ্বান খুঁজে পাচ্ছেন না। ঊনবিংশ শতকের গোড়ার দিকের বাঙালী চিন্তানায়কগণ কোন কোন ক্ষেত্রে 'কলোনাইজেশনের' বিরোধিতা করলেও এ-দেশ থেকে ইংরেজের চলে-যাওয়াটা স্বপ্নেও স্থান দিতে পারেন নি। কিন্তু তাঁদের এ-কালের বংশধরগণ আর .তদ্রূপ মোহাবিষ্ট নয়নে ইংরেজের পানে তাকাতে পারছেন না। বরং ইংরেজানুগ্রহ থেকে বঞ্চিত হয়ে তাঁরা অনুভব করছেন সে-কালের এবং এ-কালের ইংরেজ যেন এক নয়, তাদের জাত যেন স্বতন্ত্র। ইংরেজ-আনীত যুক্তিবাদ, শিক্ষা এবং সাহিত্য যে নতুন এক পৃথিবীর দ্বার উন্মুক্ত করে দিয়েছিল, তার সমস্ত ঐশ্বর্যসহ সে তখনও দূরবস্থিত ; তার সঙ্গে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত মানসের একান্ত মিলনের সম্ভাবনা ক্রমেই অন্তর্হিত হয়ে চলেছে। রাজনারায়ণ বসুরা তাই গভীর আক্ষেপে ঘোষণা করছেন, এর চেয়ে ইংরেজী না শিখিতাম, তাও ভাল ছিল। এতো কালের ইংরেজ-মোহের জন্য আত্মধিক্কার দেখা দিয়েছে,

এবং যারা এখনও সেরূপ মোহান্ধতার পরিচয় দেয় তাদের প্রতি বর্ষিত হয়ে চলেছে সীমাহীন বিদ্রূপ। শিবনাথ শাস্ত্রী, বিপিন পাল প্রভৃতিরা তাঁদের গুপ্ত সমিতিতে ইংরেজের দাসত্ব আর করবেন না বলে প্রতিজ্ঞা করছেন।

অর্থাৎ, যে অমৃতভাণ্ডের সন্ধান ইংরেজ নিজে থেকেই দিয়েছিল তা থেকে সে বরং তাদের বঞ্চিত করে চলেছে বলে এ-দেশ থেকে তার চলে যাওয়া অথবা তাকে বিতাড়িত করার অস্পষ্ট চেতনাও মধ্যবিত্ত মানসকে কিঞ্চিৎ অস্থির করে তুলেছে। সুরেন্দ্রনাথ সিবিল সার্বিসের ব্যাপারে ন্যায়বিচারে বঞ্চিত হয়ে জাতীয় আন্দোলনে আত্মোৎসর্গ করেছেন। শিশিরকুমার 'ইণ্ডিয়া লীগ' প্রতিষ্ঠা করেছেন। প্রতিশ্রুতি-ভরা রাজনৈতিক কলরবে কলকাতার আবহাওয়া তখন উত্তপ্ত। দেশী শিল্পপতিদের আবির্ভাবও ঠিক এই সময়েই।

এদিকে ইংরেজের নিরাভরণ সাম্রাজ্যবাদী রূপ সে প্রকাশ করেছে দুর্ভিক্ষের জন্য সংগৃহীত অর্থ আফগান যুদ্ধে ব্যয় করে। তাই ঐ শতাব্দীর গোড়ার দিকে বৃটিশ শাসনপ্রতিষ্ঠার জন্য এবং যুদ্ধে ইংরেজের বিজয়-লাভের জন্য কলকাতার যে নাগরিকদের কণ্ঠে ছিল প্রার্থনা, আজ সেখানে অভিশাপ। সরকারও দেশী সংবাদপত্রের সমালোচনায় অধৈর্য হয়ে প্রেস আইনের বলে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হরণ করেন এবং ব্যাপক নিরস্ত্রীকরণের উদ্দেশ্যে আর্মস্ এ্যাক্ট পাশ করেন। অর্থাৎ ইঙ্গ-ভারতীয় সম্পর্ক একটা নিশ্চিত বিরোধ ও সংঘাতের পথ ধরে অগ্রসর হয়ে চলেছে।

এই বিরোধের অস্তিত্ব ইতিপূর্বেই একটা উগ্র স্বাজাত্যবোধের জন্ম দিয়েছিল। চৈত্র-মেলাকে কেন্দ্র করে যা-কিছু ভারতীয় অথবা জাতীয় অথবা দেশজ তাকেই শ্রেয় এবং প্রেয় বলে গ্রহণ করার একটা অযৌক্তিক

উদ্দীপনা মধ্যবিত্ত মানসকে রঞ্জিত করে দিয়েছিল। যা-কিছু অকিঞ্চিৎকর অথবা তুচ্ছ তাকে অবলম্বন করে ইংরেজের সঙ্গে প্রতিযোগিতা এমন কি বৈরিতার আস্ফালনে মন উদ্‌ভ্রান্ত। যে ইংরেজ-সাহচর্য এককালে ছিল সর্বপ্রকার বৈষয়িক ও ব্যবহারিক সমৃদ্ধির একমাত্র উপায়, সেই ইংরেজ সাহচর্যই তখন ক্রমাগত ব্যর্থতা, নৈরাশ্য ও দুর্গতির বাহন হয়ে পড়ছে। যে-মন ইংরেজকে আশ্রয় করে বিকশিত হয়েছিল, সে-মন ক্ষোভে-দুঃখে বেদনায় ইংরেজকে ত্যাগ করে কেন্দ্রচ্যুত হয়ে পড়ছে; আর সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজ-আশ্রিত সমস্ত মূল্যবোধ ও মানস-বৈশিষ্ট্যের কাঠামো যেন ভেঙ্গে পড়ছে। রাজা রামমোহন বলেছিলেন, ইংরেজ আগমনে যে রাজনৈতিক ও সামাজিক সুফলের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে, তা ভোগ করার জন্যই ভারতীয়দের ধর্মীয় আচার-আচরণে পরিবর্তন হওয়া উচিত। পরিবর্তন হয়েও ছিল। কিন্তু, বর্তমানে, সেই সুফল মৃগতৃষ্ণিকার মতো নিরন্তর বঞ্চনা করে চলেছে বলে রাজা রামমোহনের মানস-বংশধরগণ পুরাতন শ্রুতি-স্মৃতি-বিশ্বাস আর মোহের কোলে আশ্রয় গ্রহণ করে ব্যর্থ ও অস্বীকৃত বর্তমানের ক্ষতিপূরণ করছেন। ইংরেজী শিক্ষা এবং পশ্চিমের দিগন্ত-বিস্তৃত আলোক যদি এই মর্ত্যভূমিকে স্বাদে-গন্ধে-ঐশ্বর্যে ভরে না দিলো, তা হ'লে কী লাভ তা অনুসরণে, কী লাভ ইংরেজের এ-দেশে থাকবার? কী লাভ পাশ্চাত্য যুক্তিবাদ বুদ্ধিবাদ ইত্যাদির চর্চায়?

ইংরেজের সঙ্গে আত্মীয়তার বন্ধন তখন পর্যন্ত ছিন্ন না হলেও যুগমানস এমনি ভাবনায় ভাবিত হয়ে চলেছে। এবং ভারতের সমাজ-ইতিহাস বিকাশের নতুন পথে বাঁক নিয়েছে। এই সময়ে, সমাজক্রান্তির ঐ লগ্নে, যাঁরা এর বিচিত্র আবর্তে অবগাহন করেছেন, তাঁদের চিন্তায়, কর্মে, ভাব-ভাবনায় এবং জীবন-অধ্যয়নে ঐ কালের অস্থির

তার এবং প্রাচীন ভারতীয় জীবনাদর্শে আশ্রয় খোঁজার ছাপ সুস্পষ্ট।

তাঁদের কণ্ঠকে আশ্রয় করে নতুন কাল নতুন বাণী ও সুর ছড়িয়ে দিয়েছিল বাতাসে।

॥ ২ ॥

অবশ্য প্রাচীন ভারতীয় মূল্যবোধ, ধর্মাদর্শ এবং ঐতিহ্যে আশ্রয় গ্রহণ কারও পক্ষেই সহজ অথবা নির্বিরোধ হয়নি। নরেন্দ্রনাথের জীবনেও তা হয়নি।

তৎকালীন ইংরেজ-আনীত ভাবাদর্শের মানস-সন্তানদের মতো নরেন্দ্রনাথও পাশ্চাত্য যুক্তিবাদ, ধ্যানধারণা ইত্যাদিকে নিজ জীবনের উপস্থিত আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। পাশ্চাত্য দর্শন শাস্ত্রাদিতে কৃতবিদ্য ছিলেন তিনি ; আর তাঁর পিতার আচার-আচরণ ও মনোভঙ্গির মধ্যেও তিনি অভিব্যক্ত দেখেছিলেন পাশ্চাত্য প্রত্যক্ষবাদ, যা তাঁকে একরকম নাস্তিক্যবাদীর পর্যায়ে টেনে নিয়ে গিয়েছিল। পিতার স্নেহ-সান্নিধ্য এবং পঠনপাঠনে উৎসাহ অগোচরে নরেন্দ্রনাথের মনে প্রত্যক্ষবাদ, বুদ্ধিবাদী মনন এবং বিশ্লেষণধর্মী চিন্তার সূত্রপাত করে থাকবে। (১) তাঁদের পারিবারিক জীবনও বিলাস ও আড়ম্বরের মধ্যেই অতিবাহিত হ'তো। ঐ আমলে এই শ্রেণীর বৈষয়িক সমৃদ্ধি লাভ-করা পরিবারের স্বাভাবিক যে ভাবপরিমণ্ডল—অর্থাৎ দেশীয় আচার-ব্যবহার, সামাজিক রীতিনীতির প্রতি অশ্রদ্ধা এবং একটা নিশ্চিত প্রেয়বাদ (hedonism)—তার সংস্পর্শে নরেন্দ্রনাথের কৈশোর অতিবাহিত হয়েছিল।

(১) নরেন্দ্রনাথের পিতা একখানা বাইবেল হাতে নিয়ে তাঁকে বলেছিলেন, জগতে যদি ধর্ম কোথায়ও থেকে থাকে তো এখানে।

সুতরাং, তাঁর চলনবলনে একটা অবাঞ্ছিত দম্ভ, উদ্দামতা এবং অপরের প্রতি শ্রদ্ধাহীন উন্নাসিকতা স্বাভাবিক। তার উপর তিনি ছিলেন নানাবিধ কলাকৌশলে পারদর্শী; অনন্যসাধারণ মানসিক ও দৈহিক শক্তিতে শক্তিমান। শৈশব থেকেই আর সকলের চেয়ে নিজের শ্রেষ্ঠতা অনুভব করতে পেরেছিলেন তিনি। আর, সম্ভবত এই কারণেই, তাঁর মনে বাসা বেঁধেছিল পরিমিতিহীন দুর্বার বাসনা,—সকলের উপর কর্তৃত্ব করার, রাজোচিত সম্মান ভোগ করার, অথবা ঋষির মতো সর্বস্ব ত্যাগ করার। (২) দিনের পর দিন তাঁর এই অস্পষ্ট অস্থির বাসনারাজি তাঁকে কোন্ মোহময় স্বপ্ন-সমুদ্রে ভাসিয়ে নিয়ে যেত কে জানে!

সে-আমলের রীতি অনুযায়ী তিনিও ব্রাহ্ম সমাজে যোগদান করেছিলেন। কিন্তু ব্রাহ্মসমাজ তখন নানারকম আত্মকলহে বিদীর্ণ। বিশেষ ঐতিহাসিক-সামাজিক পরিবেশে এবং কালের অন্তর-প্রেরণার প্রয়োজনে ব্রাহ্ম-আন্দোলন একটা সৃষ্টিশীল শক্তিরূপে আবির্ভূত হয়েছিল, কিন্তু কালপ্রবাহের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ঐতিহাসিক উপযোগিতা এবং প্রয়োজনীয়তাও উত্তরোত্তর ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে আসছিল। নেতৃস্থানীয় ব্রাহ্মরাও তাঁদের ব্রহ্মবাদে স্থির অচল থাকতে পারছিলেন না। কেশবচন্দ্রের অতিরিক্ত 'ইউরোপীয়ানা'র প্রতিবাদে রাজনারায়ণ বসু হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা সম্পর্কে বক্তৃতা করছেন, সনাতনপন্থীরা হিন্দুদের মতো উপবীত ধারণ করতে আরম্ভ করেছেন, কেশবচন্দ্র তার ব্রহ্ম-ব্যাখান

(২) তিনি স্বয়ং বলেছেন, যৌবনে দুটি স্বপ্ন তাঁকে ব্যাকুল করতো। কখনো তিনি দেখতেন, পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ সম্মান ভোগ করছেন তিনি; আবার কখনো সর্বত্যাগী ঋষির মতো পথপ্রান্তে বিচরণ করছেন।

এবং উপাসনাপদ্ধতিতে বৈষ্ণবসুলভ ভক্তিবাদ তো আমদানী করেছেনই, উপরন্তু রামকৃষ্ণের প্রভাবে তিনি তাঁর পরম কারুণিক জগৎপিতাকে মাতৃরূপে উপলব্ধি করতে সুরু করেছেন ; ১৮৭২ সালের সিবিল ম্যারেজের নিয়ম লঙ্ঘন করে তিনিই আবার হিন্দুমতে তাঁর কন্যার বিবাহ দিয়েছেন ; রাজনারায়ণ বসু বলেছেন, আরও অনেক 'প্রসিদ্ধ ব্রাহ্ম'ও নাকি হিন্দুমতে পারিবারিক বিবাহাদি সম্পন্ন করেন। এদিকে, রামকৃষ্ণ বড়ো বড়ো ব্রাহ্মদের চিত্ত জয় করে বসেছেন। এ সম্পর্কে ১৮৭৯ সালে অন্যতম ব্রাহ্মনেতা প্রতাপচন্দ্র মজুমদার লিখেছিলেন, 'যখনই তাঁহার (রামকৃষ্ণের) সহিত দেখা হয়, তখনই তিনি যে অনির্ব্বচনীয়, রহস্যপূর্ণ ভাবনিচয়ে আমার হৃদয় পূর্ণ করিয়া দেন, তাহার প্রভাব হইতে আমার মন এপর্য্যন্ত মুক্ত হইতে পারে নাই।

'তাহার এবং আমার মধ্যে 'সাদৃশ্য' কি? আমি—ইউরোপীয় ভাবাপন্ন, সভ্য, আত্মাভিমানী, অর্দ্ধসন্দেহবাদী, তথাকথিত শিক্ষিত যুক্তিবাদী এবং তিনি—দরিদ্র, বর্ণজ্ঞানহীন, অমার্জ্জিতরুচি, অর্দ্ধ-পৌত্তলিক, বন্ধুহীন, হিন্দু ভক্ত। কেন আমি তাঁহার কথা শ্রবণ করিবার জন্য বহুক্ষণ বসিয়া থাকি? আমি—যে, ডেসরাইল, ফসেট, ষ্টেনলী, ম্যাক্সমূলর এবং পাশ্চাত্য জগতের সমুদয় মনীষী ও ধর্ম্মপ্রচারকগণের উপদেশ শ্রবণ করিয়াছি ; আমি—যে, যীশুখৃষ্টের একজন একান্ত ভক্ত ও অনুচর, উদারহৃদয় খৃষ্টান মিশনারিগণের বন্ধু ও সমর্থক, যুক্তিপন্থী ব্রাহ্মসমাজের অনুগত ভক্ত ও কর্ম্মী, কেন আমি তাঁহার বাক্য শ্রবণকালে মন্ত্রমুগ্ধবৎ হইয়া যাই? এবং আমি একা নই, আমার মত বহু ব্যক্তিই এইরূপ হইয়া থাকেন।' (৩)

---

(৩) সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদারের অনুবাদ।

ব্রাহ্মসমাজের এবং ব্রাহ্ম নেতৃবৃন্দের এই বিপর্যস্ত মানসিক অবস্থায় কোন মানুষের পক্ষেই অপরকে কোন স্থির আদর্শ ও বিশ্বাসের পথে টেনে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয় ; কোনও ভাবে প্রভাবিত করা বা নেতৃত্ব দেওয়া অসম্ভব। ত্রিধাবিভক্ত ব্রাহ্মসমাজে নিত্য নৈমিত্তিক উপাসনা এবং ধর্মালোচনার ঘটা থাকলেও সৃষ্টির আলোক আর সেখানে ছিল না। ব্যক্তিগতভাবে অনেক ব্রাহ্মনেতাকে মনে প্রাণে শ্রদ্ধাভক্তি করতে থাকলেও তাঁদের কাছ থেকে নরেন্দ্রনাথ যে অস্পষ্ট অধ্যাত্ম-আলোক লাভ করেছিলেন, মিলের Essays in Religion তাকে ঝড়ো হাওয়ার মতো উড়িয়ে নিয়ে গেল। মিল এবং স্পেন্সারভক্ত নরেন্দ্রনাথ ঘোরতর সংশয়বাদী হয়ে পড়লেন।

কিন্তু চিত্ত তাঁর অভুতপূর্ব আলোড়নে বিক্ষুব্ধ। একটা স্থির সর্বগ্রাসী বিশ্বাসের মধ্যে স্থিতিলাভ করার গরজ তখন ঐকান্তিক হয়ে দেখা দিয়েছে। এমন এক বিশ্বাস, যা তাঁর দেহমনের সমস্ত বোধ ও সমগ্র সত্তাকে অভিভূত করে ফেলবে। এমনি একটা দার্শনিক ভিত্তির উপর যদি জীবনকে সংগঠিত করা সম্ভব না হয়, তাহলে বাগ্মিতায় ও ধর্ম-জীবনে কেশবচন্দ্রের চেয়ে বড়ো হওয়া অথবা পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিরূপে পূজিত হওয়া অথবা সর্বত্যাগী ঋষির মতো জীবনযাপনের বাসনা কিভাবে চরিতার্থ হবে। জীবনের সমস্ত নির্জন মুহূর্ত এই সমস্যা এবং তার সংগ্রামে বেদনাময় হয়ে উঠেছে।

বন্ধুবর ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের সঙ্গে এ নিয়ে তাঁর আলোচনা হয়। ব্রজেন্দ্রনাথ সম্ভবত Universal Reason-এর যুক্তিবাদ আশ্রয় করে বন্ধুর আধ্যাত্মিক সমস্যার সমাধান করতে চেয়েছিলেন। উপস্থিত তর্কবিচারে ব্রজেন্দ্রনাথের যুক্তি মেনে নিলেও নরেন্দ্রনাথের বিক্ষুব্ধ প্রাণ ও ব্যক্তিত্ব যুক্তির বিশুদ্ধতায় যেন শান্তি পেল না। যেন এমন একটা

সত্য ও আদর্শকে উপলব্ধি করতে চান তিনি, যাকে যুক্তি ও বুদ্ধি দিয়ে শুধু নয়—হৃদয় দিয়ে অনুভব, এমন কি দেহ দিয়ে স্পর্শ করাও সম্ভব। তাঁর ভাবনা-চিন্তা-আবেগে মথিত-হওয়া চিত্তের অবস্থা আলোচনা করলে একথাই মনে হয় যে, সত্যকে স্পর্শ করতে পারলেই যেন তাঁর সমস্ত জিজ্ঞাসা ও দুশ্চিন্তার পরিসমাপ্তি হবে। অন্যথায় নয়।

মিল-স্পেন্সারের চিন্তাধারা তাঁর মনে বিদ্রোহ এনে দিয়েছে, তার মীমাংসার পথনির্দেশ তিনি পান নি। ব্রাহ্ম নেতৃবৃন্দ তাঁর প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারেন নি। ব্রজেন্দ্রনাথ যে যুক্তিধারা অনুসরণ করে চলেছেন মন তাতে সাড়া দেয় না,—অথচ মন একটা স্থিতিশীল আদর্শের মধ্যে শান্তি পেতে চায়, তারই নিশ্চিত আলোকে জীবনকে সমৃদ্ধ করতে চায়।

নরেন্দ্রনাথ যখন এমনি সঙ্কটের মধ্যে দিনযাপন করছিলেন, তখন দক্ষিণেশ্বরের ঐ 'পাগল' ঠাকুরের খ্যাতি কলকাতায় ছড়িয়ে পড়েছে; ঐ একটিমাত্র মানুষ স্থির বিশ্বাসে পরম আত্মনির্ভরতার সঙ্গে ঘোষণা করতে পারছেন, তিনি জেনেছেন, দেখেছেন (তাঁর ঐ আত্মবিশ্বাস এবং উক্তির সামাজিক এবং দার্শনিক মূল্য যতো অকিঞ্চিৎকরই হোক না কেন)। তাঁর চোখ দিয়ে ও তাঁর মন নিয়ে সত্যকে উপলব্ধি করার জন্য অগণিত জনতার অবিশ্রান্ত স্রোত তখন দক্ষিণেশ্বরের পথে। আর শুধু তাই নয়, অন্যান্য দিকেও হিন্দুধর্মের নতুন প্লাবন এসেছে। স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতীর 'আর্যসমাজকে' কেন্দ্র করে এক অভিনব ভাববন্যা দেখা দিয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর একাধিক উপন্যাসে হিন্দু সাম্রাজ্য পুনঃসংস্থাপনের চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়ে হেষ্টি সাহেবের সঙ্গে হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা সম্পর্কে বাদানুবাদে লিপ্ত হয়েছেন। এই তরঙ্গেরই শেষ পরিণতি শশধর তর্কচূড়ামণির কলকাতা আগমন এবং তাঁর নেতৃত্বে

হিন্দুধর্মের স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম। বাইরে হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতার এই কলরব, ভেতরে নরেন্দ্রনাথের মনে সুতীব্র আধ্যাত্মিক সংকট ও আর্তনাদ।

॥ ৩ ॥

এই সময়েই একদিন শিমলা পল্লীর সুরেন্দ্রনাথ মিত্রের বাড়িতে রামকৃষ্ণ-নরেন্দ্রনাথ সাক্ষাৎকার। প্রথম সাক্ষাতের মুহূর্ত থেকে রামকৃষ্ণ যে প্রেম-প্রীতি-আসক্তির রসে নরেন্দ্রনাথকে অভিভূত করে ফেলেন, এবং ক্রমে ক্রমে রামকৃষ্ণ-নরেন্দ্র সম্পর্ক যে একটা মোহাবিষ্ট আবেশে পরিণত হয়, তা নরেন্দ্রনাথের আধ্যাত্মিক বিবর্তন ও পরিণতিতে কী অংশ গ্রহণ করেছিল তা আমরা সকলেই জানি। কিন্তু, নরেন্দ্র-প্রকৃতির যে স্বাভাবিক দম্ভ, এবং তাঁর যুক্তিবাদী মননের যে ধার তা বিনা সংগ্রামে বিশ্বাসের গর্ভে বিলীন হয়নি। প্রথম থেকেই আমরা তাঁকে দুর্জয় সংকল্পে রামকৃষ্ণের ভাবাবেশ, তাঁর সহজ প্রত্যয়, তাঁর অকপট সরলতা এবং যুক্তির স্পর্শহীন বিশ্বাসের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে মুখর হতে দেখি। নরেন্দ্রনাথের প্রতি রামকৃষ্ণের আচরণে অনেক সময় যে একটা প্রকট femininity লক্ষ্য করা যায়, তাও নরেন্দ্রকে প্রথম প্রথম উত্তেজিত করে থাকবে। কিন্তু, এই বাদানুবাদ, তর্ক, বিরোধ, বিচ্ছেদ এবং কোনদিন মিলিত-না-হওয়ার প্রতিজ্ঞা গভীর আকর্ষণের অপর পৃষ্ঠা বৈ তো নয়। ঐ প্রেম-দ্বন্দ্ব যতোই উপভোগ্য হোক না কেন, স্পষ্টই অনুভব করা যায়, যদিও নরেন্দ্রের যুক্তবাদী চিন্তাধারা রামকৃষ্ণ-আদর্শের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করছিল, কিন্তু তাঁর প্রাণশক্তিতে বিশ্বাসী মনের প্রতিরোধ দিনের পর দিন ভেঙ্গে ভেঙ্গে পড়ছিল। আবার, বিশেষ বিশেষ মুহূর্তে রামকৃষ্ণের স্পর্শ তাঁর চৈতন্যকে কোন্ আস্বাদনে রোমাঞ্চিত করে দিত, অথবা তাঁর হৃদয়তন্ত্রী সেই লগ্নে কোন্ শিহরণে পুলকিত হয়ে উঠত, তা নির্ণয় করা সুকঠিন।

কিন্তু, নরেন্দ্রনাথ অনুভব করতেন, যেন অন্য এক পৃথিবীর সন্ধান পেয়েছেন তিনি। যেন রামকৃষ্ণকে স্পর্শ করে তিনি স্পর্শ করলেন আর এক সত্তাকে, যাকে তিনি খুঁজছেন সেই সত্যকে।

ধীরে ধীরে, ঐ স্পর্শই তাঁকে পরাভূত করে দিলো। মৃত্যু হলো তাঁর। যে নরেন্দ্রনাথ পাশ্চাত্য প্রত্যক্ষবাদে বিশ্বাসী ছিলেন এবং যিনি মিল-স্পেন্সারকে অবলম্বন করে সমস্ত সহজ প্রত্যয়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করছিলেন, সংগ্রাম করছিলেন জলো অদ্বৈতবাদের বিরুদ্ধে, তাঁর মৃত্যু হলো। তিনি বিশ্বাস করলেন; প্রার্থনা করলেন, তিনি শুধু জানতে চান, শুধু বিশ্বাস করতে চান। অধ্যাত্ম-সংকটের আত্মক্ষয়ী গ্রাস থেকে মুক্তি চান।

কিন্তু, ঐ মৃত্যুর মধ্যেও আবার তাঁকে জ্বলে উঠতে দেখি। বিশেষতঃ, তাঁর পিতৃবিয়োগের পর যখন তাঁকে নিদারুণ অর্থসংকট ও দারিদ্র্যের মুখোমুখি হতে হয়। ব্যবহারিক পৃথিবীর বঞ্চনা, তার কদর্য রূপ ও হৃদয়হীনতা, এবং অকল্যাণের সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয় আবার তাঁকে সংশয়-বাদী করে তুললো। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের উক্তি তাঁর কানে নিরন্তর বাজতে থাকলো, ভগবান যদি থেকেই থাকেন এবং তিনি যদি পরম কারুণিক হয়েই থাকেন তাহলে লক্ষ লক্ষ লোকের অনাহারে মৃত্যু হয় কেন? কিছু দিনের জন্যে অন্যান্যদের মতো তিনি নিজেও সম্ভবত অধ্যাত্ম-মুক্তিসাধনার আশা পরিত্যাগ করেছিলেন। কিন্তু, দেহের শক্তি তাঁর যতোই থাক, মনের দম্ভ ও প্রতিরোধের জোর তাঁর যতো শক্তিশালীই হোক না কেন, একটানা অভাব এবং উপবাস, পারিবারিক অশান্তি এবং দৈন্যের বিরুদ্ধে নিষ্ফল সংগ্রাম, তাঁর দেহের ও মনের সমস্ত সহনশীলতাকে বিনষ্ট করে দিলো। দেহমনের বিশ্রান্তির লগ্নে তিনি পুনরায় অনুভব করলেন, তাঁর অহমিকা ও সংশয়বাদ চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে

গেছে, তাঁর সংগ্রাম শেষ হয়ে গেছে, নিরুপায় মন বিশ্বাসের অতল প্রশান্তিতে নিমজ্জিত হয়ে গেছে।

ঐ মৃত্যুই নতুন করে তাঁকে গ্রাস করে ফেলল। এবং এবারের গ্রাস পূর্ণ, নিশ্ছিদ্র। পারিবারিক, সামাজিক, এমনকি, সমস্ত মানবিক সম্পর্কের ঊর্ধ্বে উঠতে চাইলেন তিনি; সংসার ত্যাগের সংকল্প করলেন। অধ্যাত্মমুক্তি এবং ব্যক্তিগতভাবে দুঃখ থেকে নিবৃত্তিলাভের আকুতিই ঐ লগ্নে তাঁর জীবনের একমাত্র পরম ও চরম লক্ষ্যরূপে উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো।

কিন্তু আশ্চর্য এই, যিনি তাঁর মৃত্যুর নিয়ামকরূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন, তিনিই আবার তাঁকে বাঁচিয়েও রাখলেন। মানবিক-সাংসারিক সম্পর্কের মধ্যে আপাতত তাঁকে ধরে রাখলেন। অর্থ উপায়ের জন্য ব্যবহারিক কাজকর্ম এটা-সেটা করতে থাকলেন নরেন্দ্রনাথ। কিন্তু, তাঁর প্রাণশক্তিতে আস্থাশীল উচ্ছ্বাসপ্রবণ চিত্ত শান্তি পাচ্ছিল না। তাঁর প্রকৃতির বৈশিষ্ট্যই এই, যখন যাতে নিমজ্জিত হন তিনি, তখন তার সর্বশেষ সীমানায় না পৌঁছে বিশ্রাম ও স্বস্তি পান না। তাই, সমস্ত দায়দায়িত্ব—দেশের প্রতি, সমাজের প্রতি, পরিবারের প্রতি সমস্ত কর্তব্য বিস্মৃত হয়ে শুধু আত্মমুক্তি ও ব্রহ্মোপলব্ধির জন্য ব্যাকুল হয়ে পড়লেন। সেই অবস্থায় নিয়ে যাওয়ার জন্যে পীড়াপীড়ি করতে থাকলেন গুরুকে, যে অবস্থায় সমস্ত বোধ-বুদ্ধি-চৈতন্য বিলুপ্ত হয়ে যায়, আর এই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পৃথিবীর কোন অস্তিত্ব থাকে না। কিন্তু সেই গুরুই মৃত্যুশয্যা থেকে তিরস্কার করে তাঁকে পৃথিবীর পথে নামিয়ে দিলেন। বললেন, 'ভেবেছিলাম, তুই একটা মস্ত বড় পাত্র, পৃথিবীর সমস্ত মানুষ তোর মধ্যে আশ্রয় পাবে। আর তুই কিনা নিজের কথা ভেবে অস্থির হয়ে পড়েছিস। তোর লজ্জা হয় না।' যিনি মারলেন,

এমনিভাবে তিনিই বাঁচিয়েও রাখলেন। এমনিভাবে রামকৃষ্ণই নরেন্দ্রনাথের মনে দরিদ্র জনসাধারণের সেবার আদর্শ ও কার্যক্রম উদ্দীপিত রেখে গেছেন শেষ পর্যন্ত।(৪)

কিন্তু, গুরুর মৃত্যুর পর বছর দুই যেতে না যেতেই নরেন্দ্রনাথের উদ্দাম অশান্ত চিত্ত 'মায়ার' স্পর্শ ও বন্ধন ছিন্ন করার জন্য বদ্ধপরিকর হয়ে গেল। তিনি বেরিয়ে পড়লেন পথে। তাঁর সম্মুখে যে উচ্চ আদর্শ রামকৃষ্ণ স্থাপন করে গিয়েছেন, এবং শৈশব থেকেই যে দুর্বার বাসনারাজি তাঁকে প্রমত্ত করে রেখেছিল, তা এই মুহূর্তে ঠিক কতোটা জাগ্রত ছিল তা নির্ণয় করা সুকঠিন। কিন্তু, তিনি যে সাংসারিক সম্পর্কের বাইরের জগৎ—নির্জন অরণ্যের আহ্বান অনুভব করেছিলেন অন্তরে তা নিশ্চিত। তথাকথিত ইন্দ্রিয়াতীত জগতে বা ভাবে স্থিতিলাভ করার আগ্রহ তখনও তাঁর দুর্বার। তখনও পৃথিবীর বাইরের কোন মানসসৃষ্ট দেশ থেকে সত্যের সন্ধান লাভ করার বিশ্বাস অনির্বাণ ; সেই বিশ্বাস এবং আগ্রহই শেষ পর্যন্ত তাঁকে হিমালয়ের বিরাট স্তব্ধতার মধ্যে নিক্ষেপ করলো। অর্থাৎ, তখনও তাঁর পশ্চাতে সেই পূর্বকথিত মৃত্যুর তাড়না।

॥ ৪ ॥

কিন্তু এই মৃত্যুর মধ্যেই পুনরায় বেঁচে-ওঠার অঙ্কুর নিহিত ছিল। হিমালয়ের শীতল প্রশান্তির কোল থেকে নেমে এসে কন্যাকুমারী পর্যন্ত ছুটে বেড়ানোর কার্যক্রম তিনি কেন গ্রহণ করেছিলেন, অথবা তার

(৪) পরবর্তীকালেও সমস্ত আধ্যাত্মিক সংকট ও অস্থিরচিত্ততার সময় নরেন্দ্রনাথ রামকৃষ্ণের প্রভাব অনুভব করেছেন ; অনুভব করেছেন, গুরুই পথের নির্দেশ দিচ্ছেন।

মূল প্রেরণাই বা কোথা থেকে তিনি পেয়েছিলেন, সঠিক নির্ণয় করা কঠিন। রামকৃষ্ণের বাণীই হোক, অথবা তাঁর চেতন-অচেতন মনের দুর্দমনীয় বাসনাগুলিই হোক, ভূ-ভারতকে তাঁর মানসিক ঐশ্বর্য দিয়ে অভিভূত করে ফেলার জন্যই হোক, অথবা তাঁর বিশ্বাস অনুযায়ী, চৈতন্যের সমস্ত অভিব্যক্তির সহিত নিজের একাত্মতা অনুভব করার জন্যই হোক, তিনি হিমালয় থেকে ভারতের শেষ দক্ষিণপ্রান্ত পর্যন্ত পরিভ্রমণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এই পরিভ্রমণের পথে পথেই তাঁর নবজীবন, সাংসারিক সম্পর্কের মধ্যে ফিরে-আসা। ভারতের ধূলিধূসর পথেই তাঁর বাসনার অস্পষ্ট ছায়াগুলি নির্দিষ্ট নিশ্চিত রূপ পরিগ্রহ করতে থাকে, এবং তাঁর জীবনের লক্ষ্য স্থিরীকৃত হয়ে যায়। তাঁর দেহের ও মনের আগুন সৃষ্টির পথে আলোকিত হয়ে ওঠে।

জীবন ও ভারতবর্ষ সম্পর্কে নতুন পাঠ গ্রহণ করেন তিনি। তাঁর দৃষ্টির সম্মুখে প্রসারিত ভারতবর্ষকে দেখলেন তিনি,—দেখলেন, সাম্রাজ্য-বাদী শোষণ-উৎপীড়নে কী বিপর্যস্ত তার রূপ; দেখলেন, জাতিভেদ প্রথায় নিয়ন্ত্রিত ভারতবর্ষের দেহ কী কদর্য; দেখলেন, মানুষের হাতে মানুষের কী অপরিসীম লাঞ্ছনা, আর একটু শান্তি, একটু তৃপ্তি, একটু সুখ লাভের জন্য তার কী বেদনাময় আকৃতি! বর্বর, সভ্যতার আলোকহীন পাহাড়িয়া এবং ব্রাহ্মণ্য সমাজব্যবস্থার বাইরে অবস্থিত মুচী-মেথর-ধাঙ্গড়-পারিয়া থেকে আরম্ভ করে হিন্দু সমাজের সর্বোচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত ব্রাহ্মণ ও রাজপুরুষের সঙ্গে অন্তরঙ্গভাবে মেলামেশার সুযোগ পেয়েছেন তিনি; দেখেছেন, মানবিক পৃথিবীর বিচিত্র সমারোহ; বিমুগ্ধ হয়েছেন। কিন্তু পরমুহূর্তেই তাঁর চিত্ত বেদনায় কেঁদে উঠেছে—দুঃখ-দারিদ্র্য-হাহাকার-শূন্যতার যে ক্রন্দন ভারতবর্ষের জীবন আচ্ছন্ন ও গতিহীন করে রেখেছে, তার কি শেষ নেই, তা থেকে নিবৃত্তি-

লাভের কি কোন উপায় নেই? জীবনের বিমল হাসি কি এই অন্ধকারে কখনও প্রবেশ করবে না?

কথিত আছে, মধ্য ভারতে এক অস্পৃশ্য ধাঙ্গড় পরিবারের সঙ্গে বসবাসের সুযোগ হয়েছিল তাঁর। সীমাহীন অজ্ঞতা ও দারিদ্র্যের মধ্যেও যে মানবতার অভিব্যক্তি তিনি দেখতে পেয়েছিলেন সেখানে, তাতে অভিভূত হয়ে "my Country, my Country" বলে কেঁদে উঠেছিলেন। জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সমাজের নিচু স্তরের মানুষের সঙ্গে বসবাস করেছেন তিনি এবং তাদের প্রতি প্রীতি-ভালবাসা-শ্রদ্ধায় বিগলিত হয়েছে তাঁর মন। এই মনোভাবই তিনি পরবর্তীকালে ব্যক্ত করেছিলেন তাঁর 'পরিব্রাজক' গ্রন্থে: 'এরা সহস্র সহস্র বৎসর অত্যাচার সয়েচে, নীরবে সয়েচে,—তাতে পেয়েচে অপূর্ব সহিষ্ণুতা। সনাতন দুঃখ ভোগ করেচে,—তাতে পেয়েচে অটল জীবনশক্তি। এরা একমুঠো ছাতু খেয়ে দুনিয়া উল্‌টে দিতে পারবে; আধখানা রুটী পেলে ত্রৈলোক্যে এদের তেজ ধরবে না; এরা রক্তবীজের প্রাণ-সম্পন্ন। আর পেয়েচে অদ্ভুত সদাচার বল, যা ত্রৈলোক্যে নাই। এত শান্তি, এত প্রীতি, এত ভালবাসা, এত মুখটি চুপ করে দিনরাত খাটা এবং কার্যকালে সিংহের বিক্রম!!'

এইভাবে মানবিক দরদে হৃদয় তাঁর সিঞ্চিত হয়েছিল বলেই সম্ভবত ধীরে ধীরে জেগে উঠছিলেন তিনি। আর যখন যেখানে—তীর্থক্ষেত্রেই হোক বা মন্দিরেই হোক বা পর্বতের গুহায়ই হোক—তিনি প্রাচীন ভারতের ঐশ্বর্যের সন্ধান পেয়েছেন, তখনই অপূর্ব সংবেদনায় মন তাঁর অতীতমুখী হয়ে সেই ঐতিহাসিক কালে ফিরে গিয়েছে। চোখের সম্মুখে প্রসারিত বর্তমানকে অবলম্বন করে সে-মন মানসপথে স্তরের পর স্তর অতিক্রম করে উপনীত হয়েছে উপনিষদের কালে; আবার সম্ভবত

উপনিষদ থেকে যাত্রা করে অনেক ঐতিহাসিক আবর্তের মধ্য দিয়ে ফিরে এসেছে বর্তমান ভারতে। মনের এই বর্তমান-অতীত অতীত-বর্তমান পরিক্রমার মধ্য দিয়ে তার মানসপটে উদ্‌ভাসিত হয়ে উঠেছে দু'টি বিরুদ্ধভাবাপন্ন চিত্র ; একটি সাম-মন্ত্র মুখরিত অতীতের, অপরটি ছিন্ন জীর্ণ সংগীতহীন বর্তমানের। নিজেকেই সম্ভবত সংগোপনে জিজ্ঞাসা করেছেন তিনি, এই-ভারত এবং সেই-ভারত কি এক? আর, সম্ভবত বঙ্কিমচন্দ্রের মতই আর্তনাদ করে উঠেছেন—'পাথর এমন করিয়া যে পালিশ করিয়াছিল, সে কি আমাদের মত হিন্দু? এমন করিয়া বিনা বন্ধনে যে গাঁথিয়াছিল সে কি আমাদের মত হিন্দু? .....এই সকল স্ত্রীমূর্তি যারা গড়িয়াছে তারা কি হিন্দু। তখন হিন্দুকে মনে পড়িল। তখন মনে পড়িল উপনিষদ, গীতা, রামায়ণ, মহাভারত, কুমারসম্ভব, শকুন্তলা, পানিনি, কাত্যায়ণ, সাংখ্য, পাতঞ্জল, বেদান্ত, বৈশেষিক এ সকলই হিন্দুর কীর্তি—এ পুতুল কোন্ ছার। তখন মনে করিলাম, হিন্দুকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া জন্ম সার্থক করিয়াছি।' (৫) হিমালয় থেকে কন্যাকুমারী পর্যন্ত বিচিত্র জীবনযাপনের পথে এমনি চিন্তাধারা অবলম্বন করেই সম্ভবত তাঁর মন এমনি হৃদয়-সংবেদনায় উদ্বেলিত হয়ে উঠেছিল।

নরেন্দ্রনাথ যখন এমনিভাবে ভারতের পথে-প্রান্তরে নতুন নতুন অভিজ্ঞতা কুড়িয়ে নিচ্ছেন, তখন, অপরদিকে, ভারতের রাজনৈতিক আকাশও ভাস্বর হয়ে উঠেছে। কংগ্রেসের জন্ম হয়েছে কয়েক বছর আগেই, এবং তারই মাধ্যমে সংঘবদ্ধ ও ঐক্যবদ্ধ রাজনৈতিক আন্দোলনের সূত্রপাত হয়েছে। সে আন্দোলনের অন্তর্নিহিত দুর্বলতা এবং

---

(৫) 'সীতারাম'

অসম্পূর্ণতা যা-ই থাক না কেন, মোট কথা আহত ভারতবর্ষ জাতীয় আত্মাভিমানে জাগ্রত হয়ে উঠেছে। তার কিছুকাল পূর্বেই সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 'দিগ্বিজয়ী বীরের মত' (হেনরি কটনের উক্তি) উত্তর-ভারত প্রদক্ষিণ করে গিয়েছেন, এবং ঢাকা থেকে মুলতান পর্যন্ত সমস্ত যুবসম্প্রদায়কে একই ভাবে উদ্বুদ্ধ করে তুলেছেন। কংগ্রেসের অধিবেশনও কলকাতা, এলাহাবাদ, নাগপুর, বোম্বাই প্রভৃতি স্থানে অনুষ্ঠিত হয়ে গিয়েছে। ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে শত শত প্রতিনিধি আসছেন, এবং ফিরে গিয়ে আন্দোলনের বাণী ছড়িয়ে দিচ্ছেন নিজ নিজ অঞ্চলে। কালের এই নতুন বাণী, এই নতুন অন্তর-বেদনা, রাষ্ট্রীয় জীবনের কখনো উচ্চারিত, কখনো বা অনুচ্চারিত দাবীদাওয়ার ধ্বনি সম্ভবত ঐ আপাত-নির্লিপ্ত পরিব্রাজকের কানেও বেজেছিল। আর বোধ করি এ-কথাও অনুভব করে থাকবেন তিনি, ভারতের সঙ্গে যে নতুন পরিচয় হয়েছে তাঁর এবং সে পরিচয় তাঁকে প্রতিরোধের যে দুর্বার শক্তিতে দুঃসাহসী করে তুলেছে, তার মূল সুর এবং বাইরে-থেকে-আসা ঐ ধ্বনির মূল সুরে কোন তফাৎ বা বিরোধ নেই ; তারা এক। জেগে-ওঠার, কালজয়ী-বিক্রমে পৃথিবীময় ছড়িয়ে পড়ার বিদ্যুৎপ্রবাহে ভারতবর্ষ চঞ্চল। এমন একটা কিছুকে উপলব্ধি করার জন্য সে-আমলের ইংরেজের সাহচর্যে গড়ে-ওঠা মধ্যবিত্ত-মানস উদ্ভ্রান্ত, যা অপরিমেয়, যা প্রকাণ্ড ; ব্যবহারিক জীবনের দিক থেকেও, আত্মিক জীবনের দিক থেকেও। বিবেকানন্দের চিত্ত এম নিআকাঙ্ক্ষায় উদ্বেল। তাঁর অন্তর প্রেরণার সঙ্গে কালের অন্তর-বেদনা সংযুক্ত হয়ে আবার রূপান্তরিত করে দিলো তাঁকে। অগণিত মূঢ় মূক জনতার গোপন মর্মবাণী তাঁর কণ্ঠকে আশ্রয় করলো। যে নরেন্দ্রনাথ ছিলেন নির্বিকল্প সমাধি লাভের জন্য একান্ত লালায়িত, তিনি মানবিক-রাষ্ট্রিক সম্পর্কের মধ্যে ফিরে এসে

বেঁচে উঠলেন স্বামী বিবেকানন্দরূপে ; ঘোষণা করলেন, 'May I be born and reborn again and suffer a thousand miseries if only I am able to worship the only God in whom I believe, the sum total of all souls, and above all my God the wicked, my God the afflicted, my God the poor of all races !' (৬)

তিনি চিকাগোর বিশ্বধর্ম সম্মেলনে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত অনাহূতভাবে যোগদান করার সিদ্ধান্ত করলেন। জগৎ-সভায় ভারতের শ্রেষ্ঠতা প্রতিষ্ঠা করতে হবে। দেখাতে হবে, জ্ঞানে, দর্শনে, ধর্মবিদ্যায়, ন্যায়াদর্শে পৃথিবীর অন্যান্য সমস্ত দেশের ঊর্ধ্বে তার স্থান। আর এই ভারতের প্রতি পৃথিবীর যে অনস্বীকার্য কর্তব্য ও দায়িত্ব রয়েছে, সে সম্পর্কে জগৎকে অবহিত করতে হবে ; বলতে হবে, সেই ঋণ পরিশোধের দিন আজ সমাগত। সামাজিক-রাষ্ট্রিক ক্ষেত্রে স্বাধিকার লাভের এবং জাতীয় ধ্যানধারণা আচার-আচরণ মনোভঙ্গি ইত্যাদির শ্রেষ্ঠতা প্রতিপন্ন করার যে আন্দোলন ভারতে দানা বেঁধে উঠেছে, আদর্শ ও লক্ষ্য, ভাব ও অনুপ্রাণনার দিক থেকে বিবেকানন্দের আমেরিকা-অভিযান তার সঙ্গে ঐক্যবন্ধনে বাঁধা, এক। তার সমগ্র রূপের মধ্যেই ভারতীয় জাতীয়তাবাদের বিশ্ব-অভিযানের প্রকৃত পরিচয়।

॥ ৫ ॥

বিবেকানন্দ ফিরে এলেন কেশবচন্দ্রের চেয়েও বড় দিগ্বিজয়ী-বীর রূপে। তাঁর কৈশোরের দুর্বার বাসনারাজি তাঁকে সাফল্যের সর্বশেষ

(৬) উক্তিটি কিঞ্চিৎ পরবর্তীকালের, কিন্তু মনোভাব এ-কালের।

সীমায় পৌঁছে দিয়েছে। বিশ্বধর্মসভার সর্বপ্রধান ব্যক্তিরূপে তিনি আমেরিকা-ইউরোপে সম্মানিত হয়েছেন, এবং অধ্যাত্মচিন্তায় ভারতের শ্রেষ্ঠতা প্রমাণিত করেছেন। ব্যক্তিত্ব তাঁর উচ্ছ্বসিত, প্রাণ তাঁর বিশ্বজয়ের সংকল্পে উদ্বেল। সেই সংকল্প তাঁর নিজ জীবনে তো বটেই, সমসাময়িক ভারতবর্ষের সামগ্রিক জীবনে কর্মের ও জেগে-উঠার দুর্বার প্রেরণারূপে কিছুকাল জাগ্রত ছিল। কিন্তু এই সংকল্পের ঐতিহাসিক মূল্য কি তা নিরূপণ করার পূর্বে, তার স্বরূপ কি, তা-ই বিবেকানন্দের নিজস্ব উক্তির সাহায্যে বিচার করা প্রয়োজন।

ভারতে পদার্পণ করেই তিনি ঘোষণা করলেন, ভারতবর্ষের নিকট সমগ্র বিশ্বের যে ঋণ তা অপরিসীম। একটি একটি দেশ, একটি একটি জাতি ধরে বিচার করে দেখেছেন তিনি; দেখে এই সিদ্ধান্ত করেছেন, 'নিরীহ হিন্দুর' নিকট জগৎ যতোটা ঋণী তেমন আর কারও কাছেই নয়। সভ্যতার পর সভ্যতার আবির্ভাব হয়েছে, আবার তিরোধানও হয়েছে। কিন্তু ভারতের সভ্যতা, তাঁর বিচারে, চির-প্রবহমান, শাশ্বত, অক্ষয়। এই সভ্যতার বাণীই বিশ্বময় প্রচার করতে হবে। কারণ, আধুনিক বিজ্ঞানের সমস্ত বিশ্বাস ও প্রত্যয়-ধ্বংসকারী যুক্তিবাদের বিরুদ্ধে বেদান্তই স্বমহিমায় দাঁড়াতে, এবং মানুষকে মুক্তির পথ দেখাতে, পারে।

তিনি বলেছেন, জীবনের প্রথম লক্ষণই প্রসারিত, বিস্তৃত হওয়া। যে মুহূর্তে প্রসার রুদ্ধ হয়ে যায়, সে মুহূর্তেই জাতির মৃত্যু। তিনি আমেরিকা গিয়েছিলেন, না গিয়ে উপায় ছিল না বলে; কারণ, পুনর্জাগরণের প্রেরণাই তাঁকে পৃথিবীর বুকে নিক্ষেপ করেছে, সহস্র সহস্র লোককেও করবে বলে তাঁর প্রগাঢ় বিশ্বাস। [The moment you have ceased to expand, death is upon you, danger is ahead. I

went to America and Europe..... ; I have to, because that is the first sign of the revival of national life, expansion. This reviving national life, expanding inside, threw me off and thousands will be thrown off in that way. Mark my words, it has got to come if this nation lives at all.] (৭)

কিন্তু এই জাগরণ ও বিস্তৃতির রূপ কি, কোন্ পথেই বা হ'বে তার অভিব্যক্তি ? বিবেকানন্দ ভারতের সনাতন চিন্তাধারা ও কর্মবাদ অনুসরণ করে বলেছেন, জাগতিক সম্পর্কের মধ্যে প্রত্যেক বিশিষ্ট জাতিরই নির্দিষ্ট ভূমিকা রয়েছে। প্রত্যেকটি জাতি নিজ নিজ ভূমিকা যথাযথ আত্মস্থ করেই মানবিক বিকাশধারা ও সমৃদ্ধির পথে সহায়ক হতে পারে। অন্য কোন পথেই তার পক্ষে বিশ্ব-মানবজীবনে কিছু অবদান রেখে যাওয়া সম্ভব নয়। শত শত বৎসরের ঐতিহ্য এবং তাঁর চেয়েও বেশি হাজার হাজার বৎসরের 'কর্মের' তাড়না ভারতের পশ্চাতে ; সেই পুরাতন 'কর্মই' জগৎ-সভায় তার বর্তমান ভূমিকাকে নিয়ন্ত্রণ করছে, করবে ; তার হাত থেকে পরিত্রাণ লাভের কোন উপায় নেই। বলছেন তিনি, 'ইন্দ্রিয়াতীত জগতে সুগভীর আস্থা, পার্থিব জগতের প্রতি সুতীব্র ঘৃণা, ত্যাগের বিরাট ক্ষমতা, ঈশ্বরে প্রগাঢ় নির্ভরশীলতা, আত্মার অবিনশ্বরতায়, ধ্রুব বিশ্বাস,—সব, সবই আপনাদের মধ্যে রয়েছে। আমি চ্যালেঞ্জ করছি, বর্জন করুন তো সব। পারবেন না। বস্তুবাদী হওয়ার চেষ্টা করতে পারেন আপনারা, ক'মাস বস্তুবাদী

(৭) The Complete Works of Swami Vivekananda, Vol. III pp. 272-3

কথাবার্তাও বলতে পারেন, কিন্তু আমি জানি কি আপনাদের প্রকৃত স্বরূপ। যদি, খপ করে ধরি, অমনি বস্তুবাদীর মুখোস খুলে গিয়ে আস্তিক্যবাদীর চেহারা বেরিয়ে পড়বে। আপনার প্রকৃতিকে বদলাবেন কি করে আপনি?' সুতরাং, তাঁর মতে, ভারতের সমস্ত উন্নতি ও সমৃদ্ধির জন্য সর্বপ্রথম প্রয়োজন অধ্যাত্ম-জাগরণ এবং একমাত্র এই পথেই ভারত বিশ্ব ইতিহাসে তার 'কর্ম'-নিয়ন্ত্রিত আসন গ্রহণ করতে পারে। ভারতবর্ষে 'religious life forms the centre, the keynote of the whole music of national life.' জাতীয় জীবনের এই মূল সুর ও প্রেরণা যদি সে বিসর্জন করে, তা'হলে তার ধ্বংস অনিবার্য।(৮) কিন্তু, সুখের বিষয়, তা হবে না। কারণ, 'কর্ম' রয়েছে পেছনে। তিনি আরও বলেছেন, 'আমি যে আমেরিকা গিয়েছিলুম, তা আমার বা আপনাদের কারও ইচ্ছায় নয়। ভারতের ভাগ্যবিধাতা ঈশ্বরই আমাকে পাঠিয়েছিলেন, এবং পৃথিবীর দেশে দেশে অমন সহস্র সহস্র লোককে পাঠাবেন। পৃথিবীর কোন শক্তিই তা রোধ করতে পারবে না। তা অবশ্যম্ভাবী। যেতে হবে আপনাদের, প্রচার করতে হবে আপনাদের ধর্ম, পৃথিবীর প্রত্যেকটি দেশে প্রত্যেকটি জাতির নিকট।' বজ্রনির্ঘোষের মত তাঁর কণ্ঠ থেকে উচ্চারিত হচ্ছে, 'Once more the world must be conquered by India. This is the dream of my life, and I wish that each one of you who hear me to-day will have the same dream in your minds, and stop not till you have realised the dream ..Let foreigners come and flood the land with their armies, never mind. Up, India,

---

(৮) Ibid. pp. 220-21

and conquer the world with your spirituality . ...The only condition of national life, of awakened and vigorous national life, is the conquest of the world by Indian thought.' (৯)

ঐ একটি মাত্র লক্ষ্য – বিশ্ববিজয়—সম্মুখে রেখেই ভারত জেগে উঠতে পারে। 'পূণ্যভূমি' ভারতবর্ষে পদার্পণ করে অথবা তার বহু আগে থেকেই ভারতের প্রতি একটা অস্বাভাবিক মোহে হৃদয় তাঁর আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিল। তাঁর উচ্ছ্বাসপ্রবণ চিত্ত সমস্ত বিচার ও যুক্তিবাদের সুস্থির শুষ্কতা ইতিপূর্বেই বিসর্জন দিয়েছিল। ভারতবর্ষ 'পূণ্যভূমি'—অতএব এর যা-কিছু তা-ই মহৎ এবং শ্রেষ্ঠ ; এই ধরণের অভিমানে তিনি বিক্ষুব্ধ। এই মহত্ব এবং শ্রেষ্ঠতাই পৃথিবীকে স্বীকার করতে অথবা করাতে হবে। কথিত আছে, বিদেশে কয়েকজন পাদ্রীর সঙ্গে ধর্মবিষয়ক আলোচনায় তিনি নিজস্ব মতের শ্রেষ্ঠতা প্রমাণ করেছিলেন এই বলে যে, তাঁদের ধর্মের ইতিহাস রয়েছে এবং থাকবেই, কারণ মানুষ তার স্রষ্টা ; কিন্তু হিন্দুধর্মের ইতিহাস নেই, থাকতেও পারে না, কারণ তা ঈশ্বরের শ্রীমুখনিঃসৃত! তাঁর জাতীয় আত্মাভিমান অনেক সময় এমনি যুক্তিধারাই অনুসরণ করেছে। শুধু তাই নয়, ভারতবর্ষ এবং হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা প্রমাণের জন্য তাঁকে অনেক সময়ই এমন সব উক্তি করতে দেখা গিয়েছে, যার ঐতিহাসিক সত্যতা অত্যন্ত সন্দেহজনক। যেমন, তিনি বলছেন, এই ধর্মই শ্রেষ্ঠ, কারণ এ-পর্যন্ত একটা দেশও সে অধিকার করেনি, আর এই ভারতবর্ষেই হিন্দুরা মুসলমানদের জন্য মসজিদ এবং খৃষ্টানদের জন্য গীর্জা নির্মাণ করে দিয়েছিল! (১০) এদেশের মানুষ

(৯) Ibid. pp. 276-77

(১০) বৌদ্ধবিহারের উপর হিন্দুদের আক্রমণের কথাও সম্ভবত বিবেকানন্দ ঐ সময়ে বিস্মৃত হয়ে গিয়েছিলেন।

জগতের সেরা ; পশ্চিমের দরিদ্র জনসাধারণের তুলনায় ভারতবর্ষের দরিদ্ররা তো দেবশিশু (The poor in the West are devils, compared to them ours are angels) (১১) ; শুধু তাই নয়, আমেরিকায় ভারতীয় মহিলাদের উপর প্রদত্ত একটি বক্তৃতায় তিনি বলেছেন, হিন্দু সমাজে হিন্দু বিধবাদের মর্যাদা এবং প্রতিপত্তি খুবই বেশি। (১২) এই যদি সত্যিকার ভারতবর্ষের পরিচয় হয়ে থাকে, তাহ'লে তার অধঃপতন হয়েছে একথা স্বীকার করা যায় না। বিবেকানন্দও জীবনের শেষ দিকে বলেছেন, তাঁর পূর্ব ধারণা ভুল ; সত্যই ভারতবর্ষের কোনরূপ পতন হয়নি। (Thou blessed land of the Aryas, thou wast never degraded) (১৩) বরং, তার জীবন-সাধনা অব্যাহত গতিতে প্রবাহিত হয়ে চলেছে—'পৃথিবীতে অথবা স্বর্গেও' এমন কেউ নেই তা রোধ করতে পারে। সেই জীবনসাধনা, পশু-মানুষকে ঈশ্বর-মানুষে পরিণত করা (regeneration of man the brute into man the God), তার অস্তিত্বের এইটেই মূলকথা এবং একমাত্র সার্থকতা। এই পূর্ব-নির্দিষ্ট পথ থেকে সে কখনও বিচ্যুত হবে না, হয়ওনি কোন দিন—ভারতবর্ষ যেই শাসন করুক না কেন।

তাঁর চিন্তাধারা এমনিভাবেই বিবর্তিত হয়েছে। ভারতবর্ষকে তিনি যখন এর ভৌগোলিক সীমার মধ্যে স্থাপন করে বিচার করেছেন, তখন তার আভ্যন্তরীণ সমাজ জীবনের কলুষ, মানুষে-মানুষে সম্পর্কের হৃদয়-

---

(১১) The Complete Works of Swami Vivekananda Vol. IV. p. 308

(১২) Ibid. Vol. VIII.

(১৩) Ibid. Vol. IV. p. 260

হীনতা ও অযৌক্তিতার বিরুদ্ধে চিত্ত তাঁর বিদ্রোহ করেছে। কিন্তু যখনই জাগতিক সম্পর্কের মধ্যে তিনি ভারতবর্ষের বিচার করেছেন, যখন ভারতের শ্রেষ্ঠতা সম্পর্কে কোন প্রশ্নই জাগেনি তাঁর মনে। ভারতবর্ষকে এইরূপ মোহাবিষ্ট আবেগ-অনুরাগের মধ্য দিয়ে উপলব্ধি করার চেতনাই তাঁকে শান্ত, নিরুদ্বেগ থাকতে দেয়নি, অথবা বিশুদ্ধ অধ্যাত্মবাদী চিন্তা ও কার্যক্রমের মধ্যে নিবিষ্ট রাখতে পারেনি। অধ্যাত্মবাদের আলোকে বিশ্ববিজয়ের পরিকল্পনার মধ্যেও তাঁকে ক্ষণে ক্ষণে প্রমত্তের মতো ঘোষণা করতে দেখি, 'So give up being a slave. For the next fifty years this alone shall be our key-note—this our great Mother India. Let all other vain Gods disappear for that time from our mind. This is the only God that is awake, our own race, everywhere His hands, everywhere His feet, everywhere His ears, He covers everything. All other Gods are sleeping. What vain Gods shall we go after and yet cannot worship the God that we see all round us, the Virat ?' তাঁর অধ্যাত্ম বিশ্ববিজয় পরিকল্পনার সঙ্গে এই অস্পষ্ট দেশাত্মবোধ মিলিত হয়ে তাঁর দেহে এনে দিয়েছে অপরিমেয় বীর্য, শক্তি, বুকে সাহস, কণ্ঠে আশ্চর্য তেজ, আর নিজের উপর অসামান্য বিশ্বাস। সিংহল থেকে সমগ্র পূর্ব, পশ্চিম ও উত্তর ভারত প্রদক্ষিণ করেছেন তিনি ; এবং আমেরিকায় তাঁর বক্তৃতার সাফল্যে যে-দেশ গর্বিত হয়েছিল, সে দেশকে তিনি ফিরিয়ে দিয়েছেন তাঁর মানবপ্রীতি, ভালবাসা এবং ঐ পূর্বোল্লেখিত কর্মোন্মাদনায় উদ্দীপ্ত করতে চেয়েছেন তাকে। আর তেমনি পুরোহিত-অধ্যুষিত হিন্দু সমাজের নানাবিধ কলুষ ও অত্যাচারের সমালোচনায় তাঁর বক্তৃতা হয়েছে মুখর। ডাক দিয়েছেন

তিনি দেশের যুবকদের, যাদের রক্তে আছে তেজ, বীর্য, আর মাংসপেশী যাদের লোহার মতো শক্ত, যারা বিরস ভাবনারাশিতে নিমজ্জিত হয়ে পঙ্গু হয়ে থাকে না। তারাই বিশ্বঅভিযানে বেরিয়ে পড়বে। বলেছেন, দীর্ঘকাল কেঁদেছি আমরা, আর কান্না নয়, মানুষের মত মানুষ হও। যা দৈহিক শক্তিতে, বুদ্ধির দিক থেকে অথবা অধ্যাত্মচিন্তার দিক থেকে তোমাকে দুর্বল করে দেবে—তাকে বর্জন করো বিষজ্ঞানে। দরিদ্র, অত্যাচারিত এবং অজ্ঞ মূর্খের জন্য সংগ্রামে আত্মত্যাগ করো। ঈশ্বর সহায়। জীবন কিচ্ছু নয়, মৃত্যুও কিচ্ছু নয়। সংগ্রামে কে মরলো, কে পিছিয়ে পড়লো ফিরে তাকিয়ো না। মুখে শুধু একটি ধ্বনি থাক, forward—onward!

ভারতের ভৌগোলিক সীমার মধ্যে এই যাত্রা সুরু হয়ে বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়বে। কারণ, বিবেকানন্দ বলছেন, আধুনিক বস্তুবাদী সভ্যতার পীড়নে লক্ষ লক্ষ মানুষ যন্ত্রণায় আর্তনাদ করে উঠছে। এবং মুক্তির নতুন বাণীর জন্য উৎকণ্ঠায় প্রতীক্ষা করছে। ভারতবর্ষই কেবল তাদের সেই মুক্তির বাণী শোনাতে পারে ; এই দায়িত্ব পালনের জন্যই ভারতকে বিশ্ব-অভিযানে লিপ্ত হতে হ'বে। যুগে যুগে এই কাজই ভারত করে এসেছে। আবারও করবে। এবং পশু-মানুষকে ঈশ্বর-মানুষে রূপান্তরিত করবে।

॥ ৬ ॥

ইহাই স্বামী বিবেকানন্দের এবং তাঁর পরিকল্পিত ভারতবর্ষের মানস-পরিমণ্ডল।

উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিক থেকে যাত্রা সুরু করে একেবারে শেষের দিকে স্বামী বিবেকানন্দের ভাব-পরিমণ্ডলে যখন আমরা প্রবেশ করি, তখন মনে হয় সম্পূর্ণ নতুন এক জগতে প্রবেশ করলাম। এ-আকাশ

এবং রামমোহন-বিদ্যাসাগরের আকাশ যেন সম্পূর্ণ ভিন্ন জাতের। আগের আকাশ সর্বাংশে ইউরোপকে গ্রহণ করেছিল, এ-আকাশ সর্বাংশে বর্জন করতে চলেছে। বর্জন করার, নিজেকে সর্বতোভাবে শ্রেষ্ঠ বলে ঘোষণা করার প্রতিজ্ঞায় এ-আকাশ চঞ্চল। সুতরাং পূর্বগামীদের মনোভঙ্গীর সঙ্গে বিবেকানন্দের মনোভঙ্গীর কোন মিল নেই। কোন কোন ক্ষেত্রে থাকলেও সেটা একান্ত বাহ্য। ভারত-ইতিহাসের ডায়লেকটিক্ গতির প্রভাব বিবেকানন্দকে অন্য এক কল্পলোকে পৌঁছে দিয়েছে।

এই শতাব্দীর গোড়ার দিকে ইংরেজী শিক্ষাদীক্ষা এবং ন্যায়শাস্ত্রাদির অধ্যয়ন-অধ্যাপনা থেকে যে বুদ্ধিবাদী যুক্তিবাদী মানস গড়ে উঠেছিল এবং যে-মানস গোটা যুগ ধরে বাঙালী চিন্তানায়কদের সর্ববিধ কর্ম, প্রত্যয় ও ভাবনাকে নিয়ন্ত্রিত করেছে, এবং চোখের দৃষ্টিকে মনের আচ্ছন্নতা দ্বারা খর্ব করলেও যে মননশীলতা স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র পর্যন্ত বিসর্জন দিতে পারেননি, কালের নীরব সংকেতে নরেন্দ্রনাথ স্বামী বিবেকানন্দ হওয়ার পর অনায়াসেই তাকে অগ্রাহ্য করতে পারলেন। ইউরোপীয় সাহিত্য ও দর্শন থেকে পাওয়া সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ, সামাজিক আদর্শ, ব্যবহারিক জীবনাচরণের সার্বভৌম অঙ্গীকার ইত্যাদির কোন মূল্যই আর এই নব-উদ্দীপ্ত ভাবপরিমণ্ডলে নেই। যা যুক্তিগ্রাহ্য বুদ্ধিগ্রাহ্য নয়, তাকে বিশ্বাস করি না—পূর্বগামীদের এই বলিষ্ঠ প্রত্যয়ের উত্তরে বিবেকানন্দ নিঃশঙ্কচিত্তে ঘোষণা করতে পারছেন, 'What is in the intellect or reason ? It goes a few steps and there it stops. But through the heart comes the inspiration. Love opens the most impossible gates ; love is the gate to all the secrets of the universe.' 'It is through the feelings that the highest secrets are reached.' (১৪)

---

(১৪) Ibid. Vol. III. p. 225 and p. 318

কি দাম আছে যুক্তি বা বুদ্ধির! তার সাহায্যে কি সত্যকে উপলব্ধি করা যায়? প্রেম, হৃদয় বা অনুভূতিই সত্যোপলব্ধির একমাত্র পথ। ইতিপূর্বে রামমোহন-বিদ্যাসাগরের আমলে যুক্তিগ্রাহ্যতা যেখানে ছিল সমস্ত বোধ, উপলব্ধি ও চৈতন্যের একমাত্র মানদণ্ড, আজ সেখানে এসেছে হৃদয় ও অনুভূতিগ্রাহ্যতা। কিন্তু, অনুভূতি মূল্যহীন না হলেও এবং কর্মকে সরস করলেও মানুষের অনুভূতি ও হৃদয়-প্রক্ষেপের কোন নিয়ম নেই, কোন অনুশাসনও সে সহজে মানতে চায় না; তার পাত্রাপাত্র বিচার যেমন অন্ধ, যুক্তির শাসনহীন, অনুভূতির সামাজিক সত্যাসত্য নির্ধারণও তেমনি ভ্রান্ত। দৃষ্টির সম্মুখে প্রসারিত জগৎকে দেখে কাঁদলেও জীবনদর্শন ভ্রান্ত বলে ব্যর্থ কর্মপ্রবাহে আত্মনিয়োগ করে সে নিজেকে নিঃশেস করে দেয়।

তাই রাজা রামমোহন ও পরবর্তীকালের প্রাগ্রসর ভারতীয়গণ, এবং বিদ্যাসাগর মহাশয় যে কথা বলতে সম্ভবত লজ্জাবোধ করতেন, স্বামী বিবেকানন্দ তা-ই অক্লেশে ঘোষণা করতে পারছেন। সমকালীন বাঙালী তথা ভারতীয়দের অজ্ঞতা, পৃথিবী সম্পর্কে প্রকৃত জ্ঞান ও বোধের অভাব ছিল রামমোহনের নিকট অসামান্য পীড়াদায়ক, বিদ্যাসাগরও চলতি জীবনপ্রবাহের বোধহীন পাণ্ডিত্যাভিমানী ব্যক্তিদের আচরণে ক্ষোভে দুঃখে আত্মধিক্কার অনুভব করতেন। কিন্তু ভারতীয় সমাজের অনুন্নত ও দরিদ্র জনসাধারণের দুঃখদুর্দশা উৎপীড়নে ব্যথিত হওয়া সত্বেও এবং নিরন্তর তাদের উন্নীত করার চিন্তায় ব্যাপৃত থাকা সত্বেও, ঐ অভাবের জন্য বিবেকানন্দ যেন গর্বই অনুভব করছেন। বলছেন তিনি, ইউরোপ-আমেরিকায় যদি কোন চাষীকে জিজ্ঞেস করা হয়, তোমার রাজনৈতিক মতামত কি, তখন সে দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে সঠিক বিবরণ দান করবে; কিন্তু ভারতের কোন চাষীকে যদি

ঐ প্রশ্ন করা হয় তাহ'লে সে অবাক বিস্ময়ে ভাববে, রাজনীতি আবার কিরকম চীজ! ইউরোপে যে প্রলয়ঙ্কর রাজনৈতিক আন্দোলন চলছে, তার কিছুই সে জানে না, জানে না সোস্যালিজম্-এ্যানার্কিজম্ ইত্যাদি কাকে বলে বা পুঁজিপতি ও শ্রমিকের মধ্যে কি সম্পর্ক থাকা উচিত,— আর তা জানার প্রয়োজনই বা কি তার। ওটা তো তার প্রকৃতিগত নয়। ধর্ম তার জীবনের মূল প্রেরণা, ধর্মসংক্রান্ত সংবাদ সে ঠিকই রাখে। এবং তা-ই যথেষ্ট। রাজা রামমোহন প্রভৃতির মধ্যে যে কাল-সচেতন দূরদৃষ্টি এবং প্রবাহিত হতে-থাকা ব্যবহারিক জীবন সম্পর্কে নির্ভুল উপলব্ধি আমরা লক্ষ্য করেছি, বিবেকানন্দে তার কোনরূপ স্বাক্ষর নেই। নেই, আরও সম্ভবত এই কারণে যে, ধর্মসম্পর্কহীন ব্যবহারিক জীবন সম্পর্কে তাঁর অনুসন্ধিৎসা খুবই সামান্য, নেই বললেই চলে। কারণ, তাঁর মতে ধর্মই ভারতে সমাজজীবনের মূল উৎস। এইজন্যই পূর্ব-গামীদের সমাজসংস্কারমূলক আন্দোলনকে তিনি সমর্থন তো করতে পারেননই-নি, সুনজরেও দেখেননি।

বলা বাহুল্য, তাঁর বিশ্ববিজয়ের প্রত্যয় জাতীয় অহমিকা এবং উচ্ছ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত। এবং সেজন্যই ইতিহাসের বোধহীন। ধর্ম এবং অধ্যাত্ম মুক্তিচিন্তাকে তিনি অক্ষয়, অপরিবর্তনীয়, পরম জাতীয় প্রেরণারূপে গ্রহণ করেছিলেন। মানব-ইতিহাসের কোন্ স্তরে ধর্মের আবির্ভাব, তার সামাজিক ভূমিকা বা প্রয়োজনীয়তা কি, কালপ্রবাহের সঙ্গে সঙ্গে তার ভূমিকার কোন রূপান্তর হয়েছে কিনা, এসব প্রসঙ্গ তিনি বিচার করে দেখেননি। বা একথাও কখনো চিন্তা করে দেখেননি, আধুনিক সমাজবিন্যাসের মূল প্রেরণা কি এবং কোথায়, তার সঙ্গে ধর্মের সম্পর্কই বা কি, এবং ধর্মীয় রূপান্তরের সাহায্যে ঐ সমাজবিন্যাসকে কতখানিই বা প্রভাবিত ও রূপান্তরিত করা সম্ভব। জাতীয় সমৃদ্ধি

অর্জন এবং মুক্তিলাভের যে আত্যন্তিক বেদনায় কালের অন্তর মর্মরিত হয়ে উঠেছিল, সেই বেদনাই সে-কালের মানুষকে শক্তি ও অনুপ্রাণনার সন্ধানে অতীতের গর্ভে নিক্ষেপ করেছিল। সে অতীত মহিমায় ও ঐশ্বর্যে যাই হোক না কেন, তারই একটা মায়াময় মোহময় চিত্র কল্পনা করে কালের নিয়ন্ত্রণাধীন মানুষ শক্তি আহরণ করছিল, এবং বর্তমানের কর্মপ্রবাহে ছড়িয়ে পড়ছিল ভবিষ্যৎকে সৃষ্টি করার জন্য। বিবেকানন্দও তেমনিভাবে অতীতের গর্ভে নিক্ষিপ্ত হয়েছিলেন। কিন্তু, যে-বাণী সংগ্রহ করে তিনি তাঁর কালের মানুষকে এবং কালকে রূপান্তরিত করতে অগ্রসর হলেন, তার সঙ্গে কালের গরজের সম্পর্ক খুব কমই ছিল ; যেটুকু ছিল তাও বিষয়গত অপ্রত্যক্ষ দিক থেকে। সেজন্য তাকে খণ্ডিতও বলা চলে। তিনি সম্ভবত একথা কখনও উপলব্ধি করেননি যে, ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধের ভারত শুধুমাত্র হিন্দু-ভারত নয় ; বৌদ্ধ, মুসলমান, খৃষ্টান এবং বহু অগণিত জাতি ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধর্ম সম্প্রদায়ের আবাসস্থল এই ভারতবর্ষ। এ পরিবেশে হিন্দুধর্মের ভিত্তিতে 'জাতীয় ঐক্য' প্রতিষ্ঠার কার্যক্রম তাই হিন্দু ভিন্ন অন্যান্য সম্প্রদায়কে ক্ষুণ্ণ না-করে এবং দূরে না-সরিয়ে রেখে পারে না। তত্ত্ব বিচারে হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপন্ন করা সম্ভব হলেও সমস্ত ভারতকে তার নিয়ন্ত্রণাধীনে নিয়ে আসার কার্যক্রম একটা অবাঞ্ছনীয় সাম্প্রদায়িক রূপ পরিগ্রহ এবং ঐক্যের পরিবর্তে বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি না-করে পারে না, মানুষের মানবতার স্বীকৃতি সে ধর্মে যতই থাক না কেন। বিবেকানন্দের কর্মের সীমাবদ্ধতাও এইখানেই। শুদ্ধ তত্ত্ব এমনিভাবেই প্রত্যক্ষ জীবনের ক্ষেত্রে এসে খণ্ডিত হয়ে যায়। বিবেকানন্দের তত্ত্বগত নৈর্ব্যক্তিক মানবপ্রেম তাঁর কর্মনীতিগত সংকীর্ণতাকে দূর করতে পারেনি, পারেও না কখনো।

তৎকালীন সামাজিক-রাষ্ট্রিক পরিবেশে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক

সংগ্রামের ভেতর দিয়েই ধীরে ধীরে জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠার পথ পরিষ্কার হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু, রাজনীতিকে বিবেকানন্দ তাঁর কর্মের ভিত্তিরূপে কোনমতেই গ্রহণ করতে পারেন না। কারণ, তাঁর স্থির বিশ্বাস, রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড ও চিন্তা ভারতের জাতীয় জীবনের মৌল প্রেরণাসম্মত নয়। সুতরাং, তিনি মনে করেন, যা প্রকৃতিবিরোধী তাকে জাতীয় জাগরণের ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করার অর্থ নিশ্চিত বিনাশের পথে অগ্রসর হওয়া। ভারতের বিকাশ ও সমৃদ্ধি, তাঁর মতে, আধ্যাত্মিক পুনর্জাগরণের মধ্যেই নিহিত; আর শুধু ভারতের নয়, সমগ্র বিশ্ব-মানবের কল্যাণও এরই উপর নির্ভরশীল। (১৫) তাঁর নিকট রাজনীতির অর্থই হলো, বস্তুবাদী জীবনদর্শনের উপর জাতির জীবন ও সংস্কৃতিকে প্রতিষ্ঠিত করা। কিন্তু, ইতিহাস তাঁকে এই শিক্ষাই দিয়েছে বলে তার বিশ্বাস যে, বস্তুভিত্তিক সভ্যতা কখনো বাঁচে না, কখনো সত্যের প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারে না; কখনো 'মুক্তির' তাৎপর্য ও আস্বাদন লাভ করতে পারে না।

সত্যকে বিবেকানন্দ ব্যবহারিক জীবনের সহিত সম্পৃক্ত বলে, অথবা এর বিচিত্র সম্পর্ক-জাত বলে মনে করেন না। তা বস্তুজগতের বাইরে, ইন্দ্রিয়াতীত। সত্যকে উপলব্ধি করার আন্দোলন তাই বস্তুজগৎ থেকে বস্তুজগতের বাইরে অন্য কোন চৈতন্য-উদ্ভাসিত জগতে পৌঁছানোর আন্দোলন। বলা বাহুল্য, এই তত্ত্বজ্ঞান চলমান জীবনের বোধ থেকে আসেনি, অথবা সঠিক সামাজিক-সম্পর্ক নির্ধারণের পথেও নয়। এবং আসেনি বলেই জাতীয় জাগরণের বিবেকানন্দীয় পরিকল্পনার ব্যবহারিক উপযোগিতা বিন্দুমাত্রও নেই। নদীর স্রোতধারার গতি ও প্রকৃতি

(১৫) Ibid. Vol. III. p. 380

প্রবাহের নিয়ম যে নিরূপণ করতে শেখেনি তার পক্ষে সেতুবন্ধন যেমন অসম্ভব, সমাজপ্রবাহের নিয়ম, সমাজবিন্যাসের কানুন এবং মানবিক সম্পর্কের স্বরূপ যে প্রবাহিত হয়ে-চলা জীবন থেকে উপলব্ধি করতে পারল না, সমাজ তথা জীবনকে রূপান্তরিত করাও তার পক্ষে তেমনি অসম্ভব। বিবেকানন্দের উৎসাহ, শক্তি ও তেজ ছিল অপরিসীম, কিন্তু অভাব ছিল প্রত্যক্ষ জীবনকে উপলব্ধি করার বোধশক্তির। তাই, বিশ্ববিজয়ের তাঁর অধ্যাত্ম-পরিকল্পনা এবং রামকৃষ্ণ মিশন ভারতের জাতীয় জীবনের মূল-প্রবাহ থেকে দূরে সরে গেল, তার সঙ্গে সাক্ষাৎ যোগসূত্রও আর কিছু রইল না। তাঁর দূরাকাঙ্ক্ষা ছিল বিশ্ববিজয়ের কিন্তু, কার্যত ভারতের জাতীয় ঐক্য সম্পাদনও তাঁর পক্ষে সম্ভব হলো না; বিশ্বমানবপ্রীতির তত্ত্বে তাঁর অম্লান বিশ্বাস সত্বেও না। কারণ, তত্ত্ব যখন ব্যবহারিক জীবনের সঙ্গে মেলে, তখনই তা কার্যকরী; যখন মেলে না, তখন তা ব্যর্থ।

স্বামী বিবেকানন্দ নরেন্দ্রনাথ দত্তর নির্বিকল্প সমাধি লাভের আকাঙ্ক্ষা জাতির সম্মুখে অনুসরণীয় আদর্শ রূপে তুলে ধরলেন। বললেন, 'So long as you have a body, so long as you are a slave to happiness, so long as time works on you, space works on you, you are a slave. The idea, therefore, is to be free of external and internal nature.' 'Our solution is renunciation, giving up, fearlessness and love, these are the fittest to survive. Giving up the senses makes a nation survive." (১৬) ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে শুধু নয়, জাতীয় ক্ষেত্রেও জীবন-

(১৬) Ibid., pp. 128 and 205

সাধনার লক্ষ্য যেখানে এই, সেখানে ভারত স্বাধীন কি পরাধীন, ইংরেজ দেশ শাসন করবে কি করবে না, অথবা তাদের এ-দেশে থাকাটা বাঞ্ছনীয় কিনা—এসব সমস্যা ও তার বিচার মূল্যহীন। ত্যাগ আর নিবৃত্তির পথেই যেখানে মুক্তি, সেখানে ঐসব ব্যবহারিক প্রশ্নে নিমজ্জিত হওয়ার কোনরূপ প্রবৃত্তিও থাকে না। স্বামী বিবেকানন্দের দেশাত্মবোধ উচ্ছ্বাসে অস্থির হওয়া সত্বেও তাঁকে কখনো বৃটিশ শাসন থেকে মুক্ত হওয়ার স্বপ্ন দেখায়নি। এই বিশেস প্রশ্নে তাঁর উদাত্ত কণ্ঠ তেমনি নির্বাক। বিশ্ব-বিজয়ের চিন্তায় মশগুল হ'লেন তিনি, অথচ পরাধীনতার বন্ধন যে সেপথে বিরাট বাধা সৃষ্টি করে রেখেছে, তা উপলব্ধি করলেন না। তাঁর জাতিগত অভিমান পাশ্চাত্যের আচারআচরণ সামাজিক রীতিনীতির নিস্ফল অনুকরণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে মুখর হয়ে উঠেছে, ইউরোপের জীবনাদর্শ, মূল্যবোধ ইত্যাদির বিরুদ্ধে প্রাচীন ভারতীয় সাংস্কৃতিক মূল্যবোধকে শ্রেয় বলে প্রতিপন্ন করেছে, শক্তিতে বীর্যে ত্যাগে মানুস হওয়ার প্রার্থনা জানিয়েছে, ভারতের পতিত জনসাধারণের দুঃখদুর্দশায় ব্যাকুল হয়েছে, ছুটে গিয়েছে আর্তের সেবায়; কিন্তু একটি কথা স্পষ্টাক্ষরে উচ্চারিত হয়নি কখনও—রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে আমরা স্বাধিকার চাই। কখনো উপলব্ধি করেনি, কেবলমাত্র ধর্মবিশ্বাসের ঊর্ধ্বে উঠেই বিভিন্ন ধর্মবিশ্বাসআশ্রয়ী মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করা সম্ভব। কখনো ঘোষণা করেনি, ইংরেজ-আনীত জীবনাদর্শ যখন ভারতকে মুক্তির পথ দেখাতে পারে না, বা পারবেই না কখনো, তখন এদেশে তাদের অস্তিত্বও নিষ্প্রয়োজন, তাদের যেতেই বাধ্য করতে হবে একদিন। তিনি ঘোষণা করেছেন, 'England we shall conquer, England we shall possess.' কিন্তু বলেননি, রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করে; বলছেন, 'through the power of spirituality.' (১৭)

---

(১৭) Ibid., Vol. IV. p. 419

কিন্তু, দুঃখের বিষয়, যখন তিনি এসব কথা ঘোষণা করছেন, তখন—মানবিক ইতিহাসের সেকালে—অধ্যাত্মবাদ তার সে শক্তি, বীর্য ও উপযোগিতা হারিয়ে ফেলেছে।

সেজন্যই এই সিদ্ধান্ত করতে হয় যে, বিবেকানন্দ যে আন্দোলনের সূত্রপাত করলেন, তা ভারতের ব্যবহারিক রাষ্ট্রিক জীবনধারার মূল প্রবাহের বাইরে। এই আন্দোলন রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে জেগে-ওঠার প্রত্যক্ষ কোন নির্দেশ দিতে পারেনি। রামকৃষ্ণ মিশন তাই জাতীয় মিলনের কেন্দ্র না হয়ে হলো মুষ্টিমেয় কয়েকজন তথাকথিত অধ্যাত্ম-মুক্তিপিপাসুর ভ্রাতৃসংঘ। 'দরিদ্র নারায়ণের' সেবা অবশ্য তার অন্যতম উদ্দেশ্য, কিন্তু তা সমাজ-রূপান্তরের কর্মকে সহায়তা করে না। সুস্থ শান্ত মুহূর্তে এবং সম্ভবত প্রথম বারের বিদেশপ্রবাসের সময়েই বিবেকানন্দ তাঁর ভাবী কার্যক্রমের সীমাবদ্ধতা উপলব্ধি করতে পারতেন ও পেরেছিলেন। ১৮৯৫ সালের একটি পত্রে তিনি লিখেছিলেন, 'I have no ambitions beyond training individuals' এবং একথাও প্রায়ই তিনি বলতেন, 'জীবনে যদি একটি মানুষকেও মুক্তি অর্জনে সার্থকভাবে সহায়তা করতে পারি, তাহলে মনে করবো আমার পরিশ্রম ব্যর্থ হয়নি।'

বিশ্ববিজয়ের সংকল্পের পাশাপাশি একথাগুলো নিতান্তই বেমানান।

॥ ৭ ॥

কিন্তু সমাজ-ইতিহাসের বিবর্তনধারায় কোন উল্লেখযোগ্য কর্ম অথবা বাণীই নিষ্ফল নয়। সৃষ্টির পথে কোন-না-কোন ভাবে সে তার অবদান রেখে যায়। ইতিহাসের ইহাই ডায়লেকটিক কৌতুক। স্বামী বিবেকানন্দের অধ্যাত্ম পুনর্জাগরণের আন্দোলন ভারতের বৈষয়িক উন্নতি ও জীবন-প্রবাহের সঙ্গে সম্পৃক্ত না হলেও নিষ্ফল নয়; বরং বিপরীতধর্মী হওয়া

সত্বেও ঐ আন্দোলন ভারতের আধুনিক বিকাশধারাকে নানাভাকে প্রভাবিত ও শক্তিশালী করে গিয়েছে। এবং পরোক্ষে, রাজনৈতিক জাগরণের প্রেরণা জুগিয়েছে।

কারণ, যিনি ডাক দিয়েছিলেন অধ্যাত্মশক্তিতে বিশ্ববিজয়েব অভিযানে, তাঁর কণ্ঠ থেকেই প্রতিনিয়ত উচ্চারিত হতো, 'Feel, my childern, feel ; feel for the poor, the ignorant, the down-trodden, feel till the heart stops and the brain reels and you think you wlll go mad—struggle, struggle was my motto for the last ten years. Struggle, still say I. When it was all dark I used to say, struggle ; when light is breaking in, I still say, struggle.' অনেক সময় তাঁর অধ্যাত্ম-জীবনসাধনার প্রেরণার কথা বিস্মৃত হয়ে তিনি বলে উঠতেন, 'Bread ! Bread ! I do not believe in a God who cannot give me bread here, giving me eternal bliss in heaven.' এই সব উক্তির মধ্যে একটী অনায়াসলক্ষ্য আত্যন্তিকতা, বা ইংরেজীতে যাকে আমরা immediacy বলি, রয়েছে ; এবং জাতীয় অভিমানে বিক্ষুব্ধ ভারত সে আহ্বানে নীরব থাকতে পারেনি। সহস্র সহস্র যুবক ব্যক্তিগত সুখদুঃখ আশা-আকাঙ্ক্ষা এবং জীবনকে তুচ্ছ করে বেরিয়ে এসেছে—অত্যাচারে শোষণে লাঞ্ছিত ভারতের সঙ্গে নতুন পরিচয় হয়েছে তাদের, কর্মশক্তিতে দুর্বার হয়েছে তারা।

কিন্তু, কালের যে অন্তর-প্রেরণা বিবেকানন্দকে উদ্বুদ্ধ করেছিল বিশ্বজয়ের সঙ্কল্পে, সেই প্রেরণাই এই সব ঘর-ছেড়ে-আসা যুবকদের বিবেকানন্দ-প্রদর্শিত পথ থেকে সরিয়ে এনে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র পথে নিয়ে গিয়েছে। তারা এসেছিল ভারতের 'দরিদ্র নারায়ণের' সেবার পথে

বিশ্ববিজয়ের অধ্যাত্ম সংকল্প নিয়ে, কিন্তু তাদের অধিকাংশেরই পরবর্তী জীবন ব্যয়িত হয়েছে সশস্ত্র আন্দোলনের পথে ভারতবর্ষ থেকে ইংরেজ বিতাড়নের কর্মে। প্রত্যক্ষ জীবনের বোধ ও উপলব্ধি তাদের নিকট মুক্তির নতুন অর্থ উন্মীলিত করেছে, এবং সম্পূর্ণ নতুন অর্থে তাদের দেশপ্রেমকে সঞ্জীবিত করেছে। কালের বিচিত্র গতি এমনিভাবেই মানুষকে রূপ থেকে রূপান্তরে নিয়ে যায়। ব্যক্তি-সত্তা ঠিক এমনিভাবেই নতুন রূপ পরিগ্রহ করে। বিবেকানন্দের নিজস্ব উক্তিও এই রূপান্তরকে সম্ভব করে তুলেছে; কারণ, তিনি স্বয়ংই কি বলেননি, "Conquest of England, Europe and America—this should be our one supreme Mantra at present, in it lies the well-being of the country." (১৮)

আজ আমরা সামাজিক ক্রমের পথে বহুদূর অগ্রসর হয়ে এসেছি। ভারতবর্ষের জাতীয় সামাজিক জীবনও রূপান্তরিত। যে অন্তর-প্রেরণা বিবেকানন্দের কালকে উদ্বুদ্ধ করেছিল, তার সঙ্গে এ-কালের অন্তর-বেদনার কোন মিল নেই। মিল নেই বলেই সেই আমলের পূর্বকথিত অধ্যাত্ম আন্দোলন এ-কালে চালিয়ে যাওয়া একরকম প্রতিক্রিয়াশীলতা, এবং রূপান্তরকে অস্বীকার করার ব্যর্থ প্রয়াস।

কিন্তু, ঘোষিত আদর্শ ভিন্নতর হওয়া সত্ত্বেও এবং আধুনিক ভারতের রাজনৈতিক-সামাজিক-রাষ্ট্রিক আশা আকাঙ্ক্ষার সুস্পষ্ট চিত্র বিবেকানন্দ-মানসে উদ্ভাসিত না হয়ে থাকলেও, এর আবির্ভাবে তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। প্রসঙ্গত বৃটিশ দার্শনিক হোয়াইটহেডের একটি উক্তি মনে পড়ছে: 'Senseless agencies and formulated aspirations

(১৮) Ibid., Vol IV. p. 419

co-operate in the work of driving mankind from its old anchorage.” বুদ্ধিবাদ ও যুক্তিবাদ অস্বীকার করে শুধু হৃদয়-সর্বস্বতা ও অধ্যাত্মবাদের পথে ভারতকে জাগ্রত করার যে পরিকল্পনা বিবেকানন্দের ছিল, কালের রূপান্তরশীল চেতনার সঙ্গে তার মিল ছিল না বলেই তা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। নতুন কালকে সৃষ্টি করার শক্তি ও ব্যবহারিক ঐশ্বর্য তার ছিল না। দার্শনিক বিচারে সম্ভবত তা ‘Senseless’ও বটে। কিন্তু, তা সত্ত্বেও, জাতীয় বিকাশধারার ইতিহাসে তার মূল্য অকিঞ্চিৎকর নয়। নিষ্ফল হওয়া তো দূরের কথা।

উনবিংশ শতাব্দীর সাংস্কৃতিক পটভূমি

প্রত্যেক ঐতিহাসিক কালই বিকশিত হয় তার নিজস্ব অন্তর-প্রেরণার গরজে। এই গরজ কখনো বা আসে সমাজের আভ্যন্তরীণ প্রবাহের নিয়ম এবং গতি থেকে, কখনো বা বহিরাক্রমণ অথবা যোগাযোগ থেকে। জীবন যখন নিজ দেশের ভৌগোলিক সীমায় আবদ্ধ থাকে, এবং ব্যবহারিক ও মনোজীবনের সব রকম সম্পদ ও অভিব্যক্তির জন্যে নিজস্ব সঞ্চয়ের ওপরই থাকে একান্ত নির্ভরশীল, তখন সামাজিক বিকাশধারা একটা সীমায় পৌঁছে' ধীরে ধীরে অবরুদ্ধতায় গতিহারা হয়; কারণ, বিকাশের যতোটুকু সম্ভাবনা ছিল তার অঙ্কুরে তার সবটুকু রূপই সে অঙ্গে ধারণ করেছে। বিকাশের ঐ পথে, ঐ নিয়ম অনুসরণ করে, আর নতুন কোন সুরভি ছড়ানোর শক্তি তার থাকে না,—ধীরে ধীরে অবক্ষয়ের পথে অগ্রসর হয় সে।

কালের ঐ জরাগ্রস্ত দশায় তাতে নতুন অন্তর-প্রেরণার গরজ এনে দেয় বহিঃপৃথিবীর সহিত সংযোগ অথবা সংঘাত। ফুটে ওঠার নতুন যাত্রা সুরু হয়। বিগত কয়েক শ' বছরের বিশ্ব-ইতিহাসে এই বহিঃ-সংযোগই সমাজ-রূপান্তরের প্রধান কারণ (instrument) হিসেবে দেখা দিয়েছে। বণিকতন্ত্র, বণিকতন্ত্রের ধনতন্ত্রে রূপান্তরিত হওয়ার পথে, এবং ধনতন্ত্রের সাম্রাজ্যবাদে পরিণত হওয়ার সামাজিক ক্রমের মধ্য দিয়ে বহু জাতি, বহু দেশ, বহু গোষ্ঠী নিজস্ব স্বকীয়তা, স্বাধীনতা এবং মানস-বৈশিষ্ট্য হারিয়েছে সত্য, কিন্তু এই পরাধীনতার পথেই তারা

ফিরে পেয়েছে নতুন পথে বিকশিত হওয়ার অন্তর-প্রেরণা। ব্রুক্স্ এ্যাডাম্স্ খুব সুন্দরভাবে দেখিয়েছেন, কিভাবে সওদাগরী ও অনুসারী দস্যুতা, লুঠতরাজ প্রভৃতির মাধ্যমে আমেরিকার সোনা ইউরোপে, এবং বিবিধ পণ্যের বিনিময়ে ইউরোপ থেকে ভারতবর্ষ এবং দূর প্রাচ্যের অন্যান্য দেশে সঞ্চিত হতে থাকে; লক্ষ লক্ষ মানুষের যুগ যুগ ধরে সঞ্চিত হতে-থাকা সোনাই আবার কিভাবে ইংরেজ বণিকের জাহাজে চড়ে' ইংল্যাণ্ডে ফিরে যায়, এবং সেখানে শিল্পবিপ্লব ঘটায়।(১) এমনিভাবে বহিঃসংযোগ অথবা সংঘাতের ভেতর দিয়ে নিজস্ব পরিধির মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন দেশ ও জাতি এবং সাধারণভাবে সমগ্র মানব-ইতিহাস বিকাশধারার পরবর্তী অধ্যায়ে প্রবেশ করে।

আধুনিক ভারতের সাংস্কৃতিক বিকাশের ক্ষেত্রে, ইতিহাসের অচেতন হাতিয়ার রূপে অন্তর-প্রেরণা যুগিয়েছে ইংরেজ। সেদিন, ভারতবর্ষ হারিয়েছিল নিজেকে; কিন্তু, আরেক অর্থে, পেয়েছিল বিশ্বজগৎ।

সামাজিক বিকাশধারার আরও একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, যে জাতি বা শ্রেণী সমাজকে নব পল্লবে সাজিয়ে নতুন পথে অগ্রসর করে দেয়, (তার সৃষ্টিশীল ধর্ম বিনষ্ট না হওয়া পর্যন্ত) তার ধ্যানধারণা, মূল্যবোধ, চলনবলন, মানস-বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি সাধারণভাবে অন্যান্য সামাজিক শ্রেণী ও জনসাধারণের নিকট আদর্শ এবং অনুকরণীয় হয়ে দাঁড়ায়। শাসক ও শাসিতের, শোষক ও শোষিতের সামাজিক ও রাষ্ট্রিক সম্পর্ক মিত্রতারই হোক আর বৈরিতারই হোক, যার ইচ্ছা-অনিচ্ছা বোধবুদ্ধি ও গরজের অনুপ্রাণনায় সমাজ উদ্বুদ্ধ হয়, তার আচরণকেই সামাজিক দিক থেকে এবং ব্যক্তিগতভাবে উন্নত হওয়ার পক্ষে

(১) The Law of Civilization & Decay, 304-5 et seq.

একমাত্র কাম্য আচরণ রূপে গণ্য করা হয়। মানুষ যে সব সময় ভেবে-চিন্তে সচেতনভাবে ঐ কর্মধারায় আশ্রয় গ্রহণ করে তা নয়; সামাজিক লাভলোকসানের তাপমান যন্ত্রে বিভিন্ন আচরণের একটা তুলনামূলক বিচার করে জ্ঞাতসারে হোক বা অজ্ঞাতসারেই হোক সমাজবিধাতার দৃষ্টি ও মননকেই আত্মসাৎ করে।

তাছাড়া, সাধারণভাবে আমরা যাকে রুচি বলি, সমাজবিবর্তনে তারও বিশেষ একটা অবদান রয়েছে। তাক্ লাগিয়ে-দেওয়া বাচনভঙ্গি, পোষাক পরিচ্ছদ, অভিনব লেখনভঙ্গি, নতুন নতুন ফ্যাশন বা ষ্টাইল প্রচলিত রুচির ওপর একটা নির্দিষ্ট অথচ অচেতন আঘাত হেনে চলে। একটু হৃদয়গ্রাহী হলেই সে ফ্যাশন বা ষ্টাইল শ্রেণী-নির্বিশেষে ছড়িয়ে পড়ে সমাজের সর্বাঙ্গে, এবং মানুষের রুচিকে নতুন পথে টেনে নিয়ে যায়। নতুন পথ-পরিক্রমার কথা অবশ্য সব সময় অনুভব করা যায় না। কিন্তু, যাত্রা অব্যাহত। আর সেই চিত্তহারী রুচির পশ্চাতে যদি থাকে সমাজের সর্বপ্রধান শক্তি অর্থাৎ শাসকের হৃদয় ও মননের সংযোগ, তাহলে, কিছুকাল অন্তত, তার যাত্রা নির্বিঘ্ন এবং অপ্রতিহত।

উনবিংশ শতাব্দীতে ইংরেজ-অনুসৃত আচরণাদিও ছিল তেমনি। ইংরেজ শাসনকে যারা সহৃদয়ভাবে গ্রহণ করেছিল, এবং ইংরেজ বণিকের মুৎসদ্দিরূপে যারা বৃটিশ অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সঙ্গে বিজড়িত হয়ে পড়েছিল, শুধু যে তাদের মধ্যেই এই আচরণ ও মনোভাবের অভিব্যক্তি দেখা দিয়েছিল তা নয়, তার বিস্তৃতি ব্যাপক ও সর্বগামী। যারা ইংরেজের বিরোধিতা করছিল এবং তাদের সঙ্গে সংগ্রামে লিপ্ত ছিল, তাদের মধ্যেও বুদ্ধি, কলাকৌশল, সামরিক সংগঠন ইত্যাদি ব্যাপারে ইংরেজ-তুল্য হওয়ার আগ্রহ ছিল আত্যন্তিক। দু'একটি দৃষ্টান্তের সাহায্যে তা পরিষ্কার দেখানো যেতে পারে: ইংরেজ ব্যবহৃত

অস্ত্রশস্ত্রের প্রতি একটা মোহ থাকা স্বাভাবিক, কিন্তু ১৮৪৪ সালে গোয়ালিয়রের সেনাবাহিনীর পরনে দেখা গেল ইংরেজ সেনানীর মতো কোর্তা, আর তাদের জয়ঢাকে লেখা ছিল 'Waterloo' and 'pinsular' (peninsular). যেন ঐ শব্দ দুটিই তাদের দেহে-মনে ওয়াটারলুর শৌর্যবীর্য এনে দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট।

পাঞ্জাব-কেশরী রণজিৎ সিং-এর মধ্যে ইংরেজানুকরণের মোহ জেগেছিল দুরন্ত। তিনি তার ইতালীয় সেনাধ্যক্ষ ভেনতুরাকে ইংরেজের মতো একটা জাহাজ বানিয়ে দিতে হুকুম করেন। ভেনতুরা হতভম্ব হয়ে কর্ণেল আলেকজাণ্ডার গার্ডনার নামক জনৈক ইংরেজের শরণাপন্ন হন। কিন্তু, 'all Gardner could do was to build a two-decked barge with paddle-wheels worked by hand. It could not go more than ten yards or so against rapid stream of the Ravi, but Ranjit Singh was quite satisfied, for it could move, however slowly, without sails or oars. In Gardner's ironical words, 'he had equalled the achievement of the West in science, and that was all that he desired.' (২)

লক্ষ্ণৌ বৃটিশ অধীনে আসার বহু আগে থেকেই সেখানে গথিক স্থাপত্যের বিকাশ হয়, এবং নগরীর বাহ্য সাজসজ্জা ইউরোপীয় রাজধানী সমূহের অনুকরণে রূপান্তরিত হতে থাকে। বিশপ হেবার ১৮২৪ সালে লক্ষ্ণৌ পরিদর্শন করেন। তিনি বলেন, তখনকার লক্ষ্ণৌকে দস্তুরমত ছোটখাটো একটি ইউরোপীয় রাজধানী যথা ড্রেসডেনের মতো মনে

(২) Modern India and the West—ed. by O' Malley.

হতো। তখন কলকাতায়ও স্থাপত্যশিল্পে ইউরোপীয় প্রভাব খুবই বিস্তৃতিলাভ করে। বিরাট বিরাট কোরিন্থিয়ান স্তম্ভ দিয়ে প্রাসাদ নির্মাণের একটা রেওয়াজ পড়ে যায়। কলকাতায় বহু প্রাচীন প্রাসাদোপম অট্টালিকা এখনও সেই সাংস্কৃতিক প্রভাব ও সংমিশ্রণের সাক্ষ্য বহন করছে। তার উপর বৃটিশ আসবাব দিয়ে গৃহসজ্জা সে-আমলের বিত্তশালী ব্যক্তিদের একটা অপরিহার্য বিলাসিতা ছিল। বৃটিশ জুড়ি গাড়ীর প্রচলনও পূর্বোক্ত রুচি-রূপান্তরের একটা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য অঙ্গ।

বৃটিশ বণিক ও রাজপুরুষদের সঙ্গে যাদের হৃদ্যতা ছিল, তারা বৃটিশ এবং ইউরোপীয় ধরনের পানভোজনাদি সাদরেই গ্রহণ করেছিলেন। যারা ছিলেন একটু দূরে, তাদের অনেকের মধ্যেও তার মনোহারিত্বের স্বীকৃতি দেখতে পাওয়া যায়। লক্ষ্ণৌ-এর প্রতিষ্ঠাতা আসফ-উদ্-দৌলার বংশধর একই সঙ্গে তিন রকমের খাবারদাবার প্রস্তুত করাতেন, এবং খাবার টেবিলে একই সঙ্গে তা সরবরাহও করা হতো; মাঝখানটায় যেখানে তিনি স্বয়ং বসতেন, সেখানে ভারতীয় পাচকের রান্না সরবরাহ করা হ'তো; আর দুদিকের সারিতে একদিকে বৃটিশ এবং একদিকে ফরাসী পাচকের রান্না। তাঁর নির্দেশে তাঁকে ইংরেজী বই-এর হিন্দুস্থানী অনুবাদ পাঠ করে শোনানো হ'তো।(৩)

ধীরে ধীরে পোসাক পরিচ্ছদাদিতেও ঐ প্রভাব বিস্তৃতি লাভ করে। প্রথমত ছেলেদের ক্ষেত্রে, পরে শতাব্দীর শেষের দিকে বড়দের ক্ষেত্রেও বিজাতীয় পোষাকের ব্যবহার প্রচলিত হ'তে থাকে।

ইংরেজী শিক্ষার ব্যাপারে কলকাতায় যে প্রচণ্ড আলোড়ন দেখা

(৩) ঐ, পৃ. ৫৭২

দিয়েছিল, তাঁর ইতিহাস অল্পবিস্তর সকলেরই জানা। বর্তমানে তার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। কলকাতা থেকে বহুদূরে ভারতের দূরসীমান্তে এবং পল্লী অঞ্চলেও ঐ তরঙ্গ কী তীব্র গতিতে প্রবাহিত হয়ে চলছিল, এখানে শুধু তারই দু'একটা দৃষ্টান্ত উল্লেখ করবো। সি, ই, ট্রেভেলিয়ান তাঁর ১৮৩৮ সালের রিপোর্টে খুব বিশদ্‌ভাবেই উল্লেখ করেছেন, কিভাবে গঙ্গার ফেরি স্টীমার অথবা লঞ্চে বাঙ্গালী ছেলের দল প্রতিনিয়ত ভীড় জমাতো এবং ভিক্ষা করতো—পয়সা নয়, বই। এ প্রসঙ্গে তিনি অত্যন্ত কৌতূহলোদ্দীপক একটি কাহিনী বিবৃত করেছেন। একবার কয়েকজন ইংরেজ ভদ্রলোক স্টীমারে কলকাতা ফিরছিলেন ; পথে "Comercolly" (কামারখালি ?) থেকে এক দঙ্গল ছেলে স্টীমারে উঠে বই-এর জন্যে পীড়াপীড়ি করতে থাকে। টেবিলের উপর প্ল্যাটোর রচনাবলী ছিল একখণ্ড। জনৈক ভদ্রলোক হেসে জিজ্ঞেস করলেন, এতে চলবে ? ছেলেরা উত্তর করলো, নিশ্চয়, নিশ্চয় ; যে কোন বইতেই চলবে ; শুধু চাই একটি বই। ভদ্রলোক শেষটায় খুব বুদ্ধি করে কোয়ার্টার্লি রিভিউ থেকে একটি একটি পাতা ছেলের মধ্যে বিতরণ করে নিষ্কৃতি লাভ করেন।(৪)

তখন পর্যন্তও গোটা পাঞ্জাব বৃটিশ অস্ত্রবলের নিকট পরাজয় স্বীকার করেনি। তা সত্ত্বেও, সর্দারগণ তাদের ছেলেদের ইংরেজী শিক্ষাব্যবস্থার দরুন সীমান্তের রাজনৈতিক এজেন্টের (Political Agent) নিকট এমন পীড়াপীড়ি সুরু করেন যে, শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়ে সরকারকে ঐ উদ্দেশ্যে একজন শিক্ষক নিয়োগ করতে হয়।(৫)

---

(৪) On the Education of the People of India, Page 166-7

(৫) ঐ

হুগলী কলেজের ১৮৩৬ সালের আগষ্ট মাসের বিবরণে দেখা যায় যে, কলেজ খোলার পর মাত্র তিন দিনে ১২,০০ ছাত্র কলেজে ভর্তি হয়েছিল। আর ১৮৩৪ সালের জানুয়ারী থেকে ১৮৩৫ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত বই বিক্রীর হিসাব থেকে দেখা যায়, ঐ সময়ে ইংরেজী বই বিক্রী হয়েছে ৩১,৬৫৯ ; আধা-ইংরেজীতে আধা-দেশীয় কোন ভাষায় লেখা বই ৪,৫২২ ; বাংলা ৫,৭৫৪ ; হিন্দি-হিন্দুস্থানী ৭,৭৫৫ , পারসী ১,৪৫৪ ; ওড়িয়া ৮৩৪ ; আরবী ৩৬, এবং সংস্কৃত ১৬। হিন্দু কলেজ ও সংস্কৃত কলেজের ১৮৩৬ সালের ফেব্রুয়ারী-মার্চের তুলনামূলক হিসাব থেকে দেখা যায়, সেই সময়ে হিন্দু কলেজ ছাত্রদের বেতন বাবদ পেয়েছে ১,৩২৫৲ টাকা, আর সংস্কৃত কলেজে মাসিক ৮৲ হারে ৩০ জন, ৫৲ টাকা হারে ৭৮, অর্থাৎ মোট ৫৯০৲ টাকা ব্যয়ে ১০০ জন ছাত্রকে পুষতে হচ্ছে।(৬)

এইসব ঘটনার উল্লেখ করলাম শুধু এটা দেখানোর জন্যে যে, কিভাবে বৃটীশবিজয়ের ফলে বিজয়ীর বোধবুদ্ধি, মনন, ভাষা-সাহিত্য, রুচি, স্থাপত্যের আদর্শ ইত্যাদি ভারতবর্ষে নতুন সামাজিক গতি ও অন্তর-প্রেরণা এনে দিয়েছিল। বন্ধুতা এবং বৈরিতা,—এই উভয় সম্পর্ক থেকেই ঐ অনুপ্রাণনা ধীরে ধীরে সমাজের বুকে সঞ্চারিত হয়েছে।

কিন্তু, সামাজিক ক্রমের পরিমাপে, এই রূপান্তর যে আকস্মিক এবং ঝড়-ঝঞ্ঝায় উৎক্ষিপ্ত, তা বলাই বাহুল্য। ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক জীবন অকস্মাৎ গ্রামকেন্দ্রিক ও স্থানিক অর্থনীতি ও বিনিময় সম্পর্ক পরিত্যাগ করে আধুনিক ধনতান্ত্রিক আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক কাঠামো ও সম্পর্কের মধ্যে আকৃষ্ট হয়ে পড়েছে, তেমনি সমাজ-মানসও স্থানীয় সংস্কার

(৬) ঐ ; পৃঃ ৭৯—৮২

পরিত্যাগ করে বিশ্ব সংস্কার-সংস্কৃতির সমুদ্রে অবগাহন করতে সুরু করে। পূর্বেই বলেছি, রূপান্তরটা আকস্মিক এবং উৎক্ষিপ্ত; জোয়ারের তুলনায় জোয়ারে অবগাহনকারী ব্যক্তিদের মনের জোর ছিল খুব কম, রক্তের সহনশক্তিও কম। তাদের মানসিক অস্থিরতা এবং রূপান্তরের গলদ অনেকটা একারণেও বটে, অনেকটা তার অস্বাভাবিকতার দরুনও বটে।

বৈদেশিক আঘাত থেকে আসা অন্তর-প্রেরণা যাদের মাধ্যমে সমাজে অনুপ্রবিষ্ট হয়, তাদের জন্মবৃত্তান্ত ও অন্যান্য বৈশিষ্ট্য অন্যত্র আলোচনা করেছি। শুধু এইটুকু স্মরণ রাখলেই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট যে, তাদের সৃষ্টি হয়েছিল ইংরেজের সাম্রাজ্যিক স্বার্থে, রাজপুরুষদের খেয়ালখুসীতে ও অনুগ্রহে, এবং তারা ছিলেন সাম্রাজ্যিক কাঠামোর অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। তাদের দেহ ভারতবর্ষের, মন ইংল্যাণ্ডের।

এই পরিস্থিতিতে কিছুটা অস্বাভাবিকতা, ত্রুটি, গলদ এবং বুদ্ধিগত বর্ণ-সঙ্করত্ব দেখা দেওয়া স্বাভাবিক, এবং দেখা দিয়েছিলও। উদ্বোধনের এই গলদ ও বর্ণসঙ্করত্বের ঊর্ধ্বে ওঠা সে আমলের চিন্তানায়ক ও সাংস্কৃতিক অগ্রদূতদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। দেশীয় হাড়মাসের সঙ্গে বিদেশী মনন ও মন ঠিক জোড়া লাগেনি। সেই জন্যই সে-কালের সামাজিক আলোড়ন থেকে উদ্ভূত ব্যক্তিদের চিন্তায়, রাজনৈতিক কর্ম ও আদর্শে, সামাজিক আচরণে একটা বৈপরীত্য, অন্তর্বিরোধ এবং গলদ দেখতে পাওয়া যায়। একই নিঃশ্বাসে তাদের পক্ষে ভারতবর্ষের জন্য দুঃখ এবং ইংল্যাণ্ডের জয়গান করাও সম্ভব হয়েছে, ইংরেজের বিরুদ্ধে জয়লাভ করেও ইংরেজই রাজা হবে বলে বিজয়ের গৌরব বিসর্জন দিতে হয়েছে।

বিকাশের ঐ অস্বাভাবিকতা, বুদ্ধিগত বর্ণসঙ্করত্ব এবং আচরণের অন্তর্বিরোধ—ঊনবিংশ শতাব্দীর ইঙ্গ-বঙ্গ সম্পর্ক, সামাজিক পরিস্থিতি

এবং নবনির্মীয়মান সংস্কৃতিকে বোঝার পক্ষে অপরিহার্য। ভারতীয় সমাজ বিকাশের ডায়লেকটিক গতি বিশ্লেষণের জন্য এটাকে অন্যতম প্রধান ভিত্তিস্বরূপ গ্রহণ করতেই হবে। এবং একমাত্র এই পথেই অনেক বিভ্রান্তির হাত থেকে আত্মরক্ষা করা সম্ভব। আধুনিক ভারতের সংস্কৃতির জনকদের চরিত্রগত ও আচরণগত এই বৈশিষ্ট্য অনুধাবন করতে না পারার ফলে কতো আলোচনাই না ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে।

॥ ২ ॥

ভারতের জাতীয় আন্দোলনের বিকাশ যে পথে হয়েছে, কেন সে পথে অর্থাৎ ইংরেজকে আশ্রয় করে এবং ইংরেজকে অনেকটা সন্তুষ্ট করার পথে হয়েছে, সে সম্পর্কে এযুগেও কোন কোন লেখককে বিক্ষোভ প্রকাশ করতে দেখা গেছে। বিক্ষোভের মূলে এইরূপ একটা অযৌক্তিক বিশ্বাস বর্তমান যে, আমরা অন্যভাবেও বিবর্তিত হতে পারতাম। ঐতিহাসিক বোধের অভাব, আধুনিক কালের মন নিয়ে অতীতকে বিচার করার মনোভাব, এবং নিস্পৃহভাবে কালের অন্তর প্রেরণাকে বোঝার অক্ষমতাই যে ঐ বিশ্বাসের মূলে, সেকথা বলাই বাহুল্য। দৃষ্টিভঙ্গীর এই বিকৃতি থেকে যদি মুক্তিলাভ করা যায়, এবং নির্মোহভাবে ইতিহাসকে উপলব্ধি করা যায়, তাহলে দেখা যাবে যে, উনবিংশ শতকের গোড়ার দিক থেকে আরম্ভ করে একেবারে শেষ পর্যন্ত (এমন কি, বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিক পর্যন্ত) জাতীয় বিকাশধারার পুরোহিতদের আচরণে একটা অনায়সলক্ষ্য সঙ্গতি রয়েছে, এবং সমাজরূপান্তরের নিয়মানুসারে এই সঙ্গতির উপযুক্ত ব্যাখ্যা দেওয়াও সম্ভব।

কয়েকটি উদাহরণের সাহায্যে এই সঙ্গতির পরিচয় দেওয়া যাক। রাজা রামমোহনের কণ্ঠ থেকে বিশ্বজনগণের স্বাধীনতার নির্ঘোষ ধ্বনিত

হয়েছিল, কিন্তু তিনিই আবার নীলকর সাহেবদের পক্ষে ওকালতি করেছিলেন।

দ্বারকানাথ ঠাকুর বলেছিলেন, ইংরেজেরা ভারতের ধনসম্পদ মানইজ্জৎ ইত্যাদি সব বিনষ্ট করে দিয়েছে; আবার তিনিই শ্বেতাঙ্গ অপরাধীর বিচারের ভার যাতে দেশী বিচারকের উপর দেওয়া না হয় তার জন্য আন্দোলন করেছিলেন।

'বেঙ্গল বৃটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি' মহারাণী ভিক্টোরিয়ার আনুগত্য স্বীকার করে তাদের কর্মপরিচালনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন।

'নীল দর্পণ'-এ নীলকর সাহেবদের অত্যাচারের বিভীষিকা চিত্রিত করেও দীনবন্ধু ঐ গ্রন্থেরই ভূমিকায়· মহারাণী ভিক্টোরিয়া এবং কয়েকজন নতুন বৃটিশ সিভিলিয়ানদের উপর আস্থা স্থাপন করে বৃটিশ সুশাসন সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন।

কালীপ্রসন্ন সিংহ 'নীল দর্পণের' বিচারে আসামী পাদ্রী লং সাহেবের এক হাজার টাকা জরিমানা নিজ পকেট থেকে দিয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর মহাভারতখানা উৎসর্গ করেন মহারাণী ভিক্টোরিয়ার পাদপদ্মে।

'বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন' পার্লামেণ্টের নিকট আবেদনে বৃটিশ শাসনের নিরাপত্তার জন্য 'Safety valve' অর্থাৎ এসোসিয়েশনের দাবীদাওয়ার প্রতি সদয় হওয়ার প্রার্থনা করেন।

ভূদেব মুখোপাধ্যায় বিজাতীয় ভাবধারার প্রচুর নিন্দাবাদ করলেও অন্য কারও না হয়ে ইংরেজের অধীনতার জন্য আনন্দবোধ করেছেন। (তুলনীয় স্যার সৈয়দ আহম্মদ খানের উক্তি : All good things, spiritual and worldly, which should be found in man have been bestowed by the Almighty on Europe, and especially on England.)

বঙ্কিমচন্দ্র চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রজার পক্ষে ক্ষতিকর এই সিদ্ধান্ত করা সত্বেও পাছে ইংরেজরা মিথ্যা প্রতিপন্ন হয় সেজন্য তা রদ করতে বলবেন না। আর ইংরেজদের বিরুদ্ধে সন্তানরা বিজয়ী হওয়া সত্বেও তাঁকে চিকিৎসক আমদানী করে ইংরেজকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে হয়।

শিশির কুমার ঘোষকে বলতে শুনছি, আমরা যে রাজনৈতিক ও শাসনতান্ত্রিক অধিকার দাবী করছি তা শুধু ইংরেজের ভার লাঘব করার জন্য!

১৮৮৫ সালে এক ইংরেজ সিভিলিয়ানের তত্ত্বাবধানেই কংগ্রেসের অর্থাৎ ইংরেজবিরোধী আন্দোলনের জন্ম। আর এই কংগ্রেসমঞ্চ থেকে শতাব্দীর একেবারে শেষের দিকে কংগ্রেস সভাপতিকে ঘোষণা করতে শুনি যে, ইংরেজরা এতো উদার যে ইংরেজী ভাষায় দাসত্ব সম্পর্কে কাউকে বুঝানো যায় না!

উপরে উনবিংশ শতাব্দীর গোড়া থেকে আরম্ভ করে একেবারে শেষ পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ের উল্লেখযোগ্য চিন্তানায়কদের রচনা ও উক্তি থেকে যে উদ্ধৃতি দেওয়া হলো, তাতে একটা সুস্পষ্ট সঙ্গতি অনায়াসলক্ষ্য। ইংরেজ সম্পর্কে তাঁদের শ্রদ্ধা এবং ইংরেজের সামাজিক ন্যায়বিচার ও শুভবুদ্ধির উপর তাঁদের বিশ্বাস অবিচল। এই বিশ্বাসের কারণ যদি বিশ্লেষণ করা যায়, তাহলে তাঁদের আবির্ভাবের ঐ পূর্বোক্ত অস্বাভাবিকতা এবং বুদ্ধিগত বর্ণসঙ্করত্বে পৌঁছাতে হয়। শতাব্দীর শেষের দিকে দেশের হিতচিন্তায় তাঁদের মন বিচলিত হয়ে থাকলেও ইংরেজের পিতৃস্নেহ থেকে বঞ্চিত হওয়ার দুঃস্বপ্ন তখনও তাঁরা দেখতে শেখেননি। ফলে, গোটা শতাব্দী ধরেই আমরা নব ভারতের সংস্কৃতি-নির্মাতাদের আচরণে এবং রাজনৈতিক ব্যবহারে এই অন্তর্বিরোধ লক্ষ্য করে থাকি।

অবশ্য, কালের যাত্রাপথে অর্থনৈতিক এবং স্থানিক বহু সামাজিক কারণে বিভিন্ন স্থানে কৃষক বিদ্রোহ সংগঠিত হয়েছে, আবার সে বিদ্রোহ দমিতও হয়েছে। সেই বিদ্রোহের প্রতি দরদ, সহানুভূতি জ্ঞাপন এবং বিদ্রোহকে সমর্থনও কেউ কেউ করেছেন, আবার ঐসব বিদ্রোহকে কেন্দ্র করে কেউ কেউ 'বিপ্লব চাই' একথাও প্রকাশ্যে ঘোষণা করেছেন। কিন্তু সত্য সত্যই বিপ্লব চাওয়ার জন্যে যে রাজনৈতিক চেতনা, কালপ্রবাহ সম্পর্কে যে বোধ (আধুনিক অর্থে), তার উদ্বোধন তখনও হয়নি, এবং হয়নি বলেই তৎকালীন সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবেশে 'বিপ্লব' ভারতবর্ষীয় সভা অথবা কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা এবং কোন কোন ক্ষেত্রে জাতীয়তাবাদী গুপ্ত সভাসমিতি স্থাপনেই পর্যবসিত হয়েছে। বিপ্লবের আধুনিক অর্থ এবং তৎকালীন অর্থ তাই এক নয়; তৎকালীন অর্থ, বড় জোর ইংরেজী শিক্ষাভিমানী মধ্যবিত্তের হাতে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ছেড়ে দেওয়া, এবং ইংরেজের কর্তব্যভার লাঘব করার জন্যেই তাঁরা তা গ্রহণ করতে প্রস্তুত, সম্পর্ক ছিন্ন করার জন্যে নয়।

আমরা জানি, শতাব্দীর শেষের দিকে ইংরেজ ভারতে সেই সব শিল্প বিকাশের অনুকূল ছিল যা মূল ব্রিটিশ শিল্পের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করবে না কখনো; যথা, রেলওয়ে, ইঞ্জিনিয়ারিং, চিনি, কফি, চা, পাট ইত্যাদি। বলা বাহুল্য, এই শিল্পবিকাশ নিতান্তই পরিকল্পনাহীন ছিল, এবং ভারতবর্ষের জনগণের স্বার্থের প্রতি এই বিকাশধারার কোন দৃষ্টি ছিল না, এবং সংযোগও না। আর শিল্প বিকাশের এই পথে যে নতুন ভারতীয় বুর্জোয়াদের আবির্ভাব হয়, তাদের অস্তিত্বও ইংরেজ রাজানুকূল্য এবং শিল্পপতিদের করুণার উপরই নির্ভরশীল ছিল। জনস্বার্থের প্রতি দৃষ্টি দেওয়ার কোন প্রয়োজন

তাদের তখনও ছিল না, এখনও নেই। বরং সমস্ত দিক থেকে ইংরেজের সহযোগিতাই ছিল তাদের কাম্য। যেটুকু জাতীয়বোধের উন্মেষ তাদের মধ্যে সে আমলে দেখা দিয়েছিল অথবা জনস্বার্থের সহিত যদি কখনো একাত্মবোধ তারা করে থাকেন, তবে সেটা শুধুমাত্র মুনাফার গরজ থেকে। কারণ, পরাধীন দেশের শিল্পপতিরা পণ্যের বাজারেই জাতীয়তার পাঠ গ্রহণ করেন।

এই বুর্জোয়াশ্রেণীর আবির্ভাবের বহু আগে থেকেই আবির্ভাব হয়েছিল বৃটিশ শাসন-আশ্রিত বুদ্ধিজীবী ও বুদ্ধিবাদী শিক্ষাভিমানীর। তাদের ক্রিয়াকলাপ এবং তৎ-সংশ্লিষ্ট ইঙ্গ-ভারতীয় সম্পর্কের মাধ্যমেই ঊনবিংশ শতাব্দীর সংস্কৃতির ও সমাজজীবনের বিকাশ। সুতরাং শ্রেণী হিসেবে বিকশিত হওয়ার যেটুকু সম্ভাবনা ছিল, তা নিঃশেষে বিলীন না হওয়া পর্যন্ত এই মধ্যবিত্তের কাছ থেকে নিরঙ্কুশ বৃটিশ বিরোধী আচরণ প্রত্যাশা করা বৃথা। আধুনিক মন নিয়ে তা প্রত্যাশা করলেও তাঁরা তাতে সমর্থ হবেন কেন? তাঁদের সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের উক্তিটি তাই চমৎকারভাবে সত্য—তাঁদের দেশসেবায় দেশের অভিমান ছিল, দেশ ছিল না। কিন্তু, তা সত্বেও, আবার স্মরণ করা ভাল যে, আমাদের জাতীয় বিকাশধারা অন্য কোন পথে হ'তে পারতো না; তার অন্তর-প্রেরণাই এই ইতিহাস সৃষ্টি করেছে।

॥ ৩ ॥

তৎকালীন চিন্তানায়কদের আচরণ ও জীবনদর্শন সম্পর্কে এইমাত্র যে বৈপরীত্যের কথা আমরা আলোচনা করলাম, তা-সত্বেও শতব্দীর শেষার্ধে তারই মধ্যে রূপান্তরের একটুখানি আভাষ দেখতে পাওয়া যায়।

সিপাহী বিদ্রোহ দমন করার পর ইংরেজ ভারতে মধ্যযুগীয়

সামন্ততান্ত্রিক ও আধুনিক সাম্রাজ্যবাদী শাসন-ব্যবস্থার সংমিশ্রণে এক অভিনব মিশ্র শাসনব্যবস্থা কায়েম করে। কালের সৃষ্টিশীল অন্তর-প্রেরণার সঙ্গে ইংরেজের সংযোগ সম্ভবত সেই সময় থেকেই বিনষ্ট হয়ে যায়। এর পরে ইংরেজ আর সৃষ্টি করেনি, পুরানো সৃষ্টিকেই স্থায়িত্বের পোষাক পরানোর চেষ্টা করেছে।

ইতিমধ্যে সমগ্র ভারত নতুন এক অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় ঐক্যবদ্ধ হয়ে গিয়েছে, জাতিগঠনের কাজও একরূপ সম্পূর্ণ। বৃটিশ রাজপুরুষরাও রীতিমতো দম্ভের সহিত ঘোষণা করতে পারছেন, 'We are making a people in India where hitherto there have been hundreds of tribes but no people.' বিভিন্ন কারণে একের পর এক অনেক-গুলো চাষী বিদ্রোহ সংগঠিত হয়েছে, দুর্ভিক্ষের সাক্ষাৎ মিলেছে অনেকবার, এবং আকাল-পীড়িত দুঃস্থের সেবায় সামাজিক বোধ ও সংবেদনশীলতার পরিধিও বিস্তৃতি লাভ করেছে; প্রচলিত ইঙ্গ-ভারতীয় সম্পর্ক বিচলিত হয়েছে অনেকটা এবং শিক্ষিত মধ্যবিত্তের মনে ব্যর্থতা ও হতাশা একটু একটু করে সঞ্চিত হতে আরম্ভ করেছে; গরজের তাগিদেই দেশের মানুষকে উপস্থিত দুঃখের কথা শোনানোর আত্যন্তিক প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। আত্মবিকাশের নতুন পথ ও পাথেয় লাভের আশায় শাসনতান্ত্রিক দাবীতে রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে; এসেছে জাতীয় মেলা, জাতীয় গান, জাতীয় আত্মম্ভরিতা। অর্থাৎ, এসবের ভেতর দিয়ে, অত্যন্ত সংগোপনে ও ধীরে ধীরে, জনসাধারণ জাতীয় জীবনের প্রকাশ্য দরবারে আত্মপ্রকাশ করছিল। যতোটা না স্বেচ্ছায়, ততোটা মধ্যবিত্তের নবজাগ্রত দেশাভিমানের গরজে।

ইতিহাসের সৃষ্টিশীল কর্মপ্রেরণা ধীরে ধীরে ভারতীয়দের কণ্ঠকে

আশ্রয় করছে ; ভবিষ্যতের অস্পষ্ট কলরবও শোনা যাচ্ছে।

কিন্তু, ভবিষ্যতের এই করাঘাতের ইঙ্গিত সব সময় সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে পারে না মানুষ ; ভবিষ্যৎকে অতীত বলে ভুল করে বসে। তাই, শাসনতান্ত্রিক অধিকার আদায়ের জন্য যে আন্দোলনের সূত্রপাত, তা-ই ক্রমে বিদেশীর প্রভাব ও স্পর্শ থেকে প্রাচীন ধর্ম, জাতিগত বৈশিষ্ট্য, আচার-আচরণ, মূল্যবোধ ইত্যাদিকে বাঁচানোর সংগ্রামে পরিণত হয়। পৌরাণিক গাঁথা ও কাহিনী থেকে শক্তি, বীর্য, সাহস ও নৈতিক বল সঞ্চয়ের, এবং পৌরাণিক বীরশ্রেষ্ঠ পুরুষকে আদর্শ হিসেবে গ্রহণের মানসিক আগ্রহ সেজন্যই এ সময়টায় অতিরিক্ত দেখা দিয়েছিল। অতীতের স্বপ্নময় সমৃদ্ধি এবং অজানা ভবিষ্যতের আরও অজানা সুখ-সম্পদের মোহগ্রস্ত চিত্র একত্র মিশ্রিত হয়ে এক অভিনব ব্যঞ্জনায় বাঙ্গালী যুবকের চিত্তে উদ্‌ভাসিত হয়ে উঠেছে। পৃথিবীকে বাঁচাতে হবে ধ্বংসের হাত থেকে, পাশ্চাত্যের বস্তুপূজা, একান্ত বাহ্য ও পার্থিব সুখান্বেষণ ও কলহ-সংঘাতের কলঙ্ক থেকে পৃথিবীকে বাঁচাতে হবে—এবং বাঁচার একমাত্র পথ প্রাচীন ভারতীয় অধ্যাত্মবাদ। ভারতের যুবকের সম্মুখে তখন এই আদর্শ : You shall help to create a nation, to spiritualise an epoch, to Aryanise the world. And that nation is your n, that epoch belongs to you and your children, and that world is no mere tract of land, but the whole earth with its teeming millions.

জাতীয়তাবাদীদের এই তূর্যনিনাদের মধ্য দিয়েই বাংলায় উনবিংশ শতাব্দীর শেষ এবং বিংশ শতাব্দীর আরম্ভ।

বলা বাহুল্য, এর মন পশ্চাতে, চোখ সম্মুখে। ইংরেজের বন্ধন, এবং

সঙ্গে সঙ্গে আধুনিক সভ্যতার বস্তু-আরাধনা থেকে বিমুখ হওয়ার বাসনায় মন চলে গিয়েছিল শতসহস্র বৎসর পশ্চাতে, সেই বিস্মৃত যুগকে পুনরুজ্জীবিত করার চেষ্টাও করেছিলেন কেউ কেউ। কিন্তু অতীত ফিরে আসেনি, আসা সম্ভব নয় বলে। বর্তমান কাল ও ইংরেজকে অস্বীকার করেও ইংরেজের কাছ থেকে যেটুকু বস্তু-আরাধনা ও বুদ্ধিবাদ সমাজ-মানস আয়ত্ত করেছিল, তা-ই নতুন বাংলা, নতুন ভারতবর্ষের জন্ম দিয়ে গিয়েছে। প্রাচীনের আকর্ষণ তার এখনো কাটেনি অবশ্য, কিন্তু পুরাতন অভ্যাসের মতোই তা হৃদয়সম্পর্কহীন, নিষ্প্রাণ।

এই গ্রন্থে প্রকাশিত প্রবন্ধগুলি 'ক্রান্তি' পত্রে প্রকাশিত হ'য়েছিল। এ সুযোগে 'ক্রান্তি'র কার্যকরী সম্পাদক ও পরিচালক শ্রীযুক্ত জ্যোৎস্না সিংহরায়কে আন্তরিক ধন্যবাদ। তাঁর তাগিদ না থাকলে সম্ভবত প্রবন্ধগুলি লেখা হতো না।

অরবিন্দ পোদ্দার